বনের খাঁচায়

আনন্দ বাগচি

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক · শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ প্রণবেশ মাইতি

প্রথম সংস্করণ · অক্টোবর ১৯৬৩

কল্যাণীয় প্রদ্যোতকে

ও

কল্যাণীয়া অরুণাকে

ভূমিকা

এই উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে, অতীত বা বর্তমান কোনো ঘটনার সঙ্গে যদি কোনো সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয় তবে তা নিতান্তই দুর্ঘটনা বলে জ্ঞান করতে হবে।

—লেখক

॥ ১ ॥

হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়ে একেবারে নিষ্কর্মা বেকার হয়ে পড়েছি। হাতে অঢেল সময় অথচ কিছু করার নেই, এ এক ভয়ঙ্কর অবস্থা।

পুরনো আড্ডা ভেঙে দিয়ে প্রাণের বন্ধুরা সব একে একে দিগ্বিদিকে কেটে পড়েছে। কেউ কেউ জমিয়েছে মনের সুখে লম্বা পাড়ি। আমিই হতভাগা শুধু চন্দননগরে শুয়ে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজছি।

পড়ার বইগুলোর একেবারে ছুটি। পাঁজির মত টেস্ট-পেপার তাকে তোলা। রাশি রাশি গল্পের বই চিবিয়ে মুখ বিস্বাদ হয়ে আছে, হাতে নিলেই হাই ওঠে। কোথাও আর আমার জন্যে মজা নেই। খেলার মাঠ একঘেয়ে। পড়ে পড়ে ঘুমোবো যে তারও জো নেই। এমনি বিতিকিচ্ছি অবস্থা। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে মাইলের পর মাইল গড়াই, কিন্তু ঘুমের ত্রিসীমানায় পৌছতে পারি না।

কিছু একটা করি- খুব ইচ্ছে। কিন্তু কি করি? বাড়ির বাজারটা পর্যন্ত আমাকে করতে দেয় না কেউ। বলে কাঁচা বাজার আর কাঁচা পয়সা একই, ওসব কাঁচা বয়সের জন্যে নয়। আমি নাকি এখনো ছোট আছি।

আমার বয়সী অনেকে হয়তো এখনো সাইকেল শেখে, সাঁতারে পোক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টায় কোমর-জলে নেমে বিস্তর হাত-পা

ছোঁড়ে, কিন্তু আমার ওসব পাট চুকে গেছে কবে। এখন কি তাহলে আমার কিছুই করার নেই? নিজেকেই প্রশ্ন করে বসি। আবার নিজেই উত্তর দিই, আছে। রথতলার ভুবনমাস্টারের ইস্কুলে একবেলা টাইপ শেখা চলতে পারে। নীরস রেমিংটন মেশিনের ক্ষয়-ধরা মান্ধাতা আমলের চাবিগুলো টিপে টিপে একঘেয়ে গতের মত এল-কে-জে-এইচ ছাপ তোলা! আর একবেলা বাড়ি বয়ে গিয়ে ছেলে ঠেঙানো, মানে টিউশনী। কিন্তু এ দুটো ব্যাপারই আমার ধাতে সয় না।

তাই মনের দুঃখে ঘরে বসে 'আবার যকের ধন' বইটার ছেঁড়াখোড়া মলাটের ছবিই দেখছিলাম আধখানা মন দিয়ে। বইটি বহুবার পড়া। তার প্রতিটি পাতা মুখস্থ। এমন সময় অশ্বিনী-মামার নেমন্তন্ন পত্তরটি কে আমার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে গেল। আচমকা এরকম উড়ো পত্রাঘাতে চমকে গিয়েছিলাম। পরে মুখ তুলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। চেনা ডাকপিওন ঘরের জানলা দিয়ে চিঠিটা আমাকে টিপ করে ছুঁড়ে দিয়ে এখন কেমন দাঁত বের করে হাসছে।

আমি শুধুই চমকালাম না, চটেও গেলাম। প্রথমে পিওনের ওপরে, তারপর সে চলে যাবার পর স্বয়ং অশ্বিনীমামার ওপরে। মামার এই রসিকতার কোনো মানে হয়? অতবড় খামখানা ছিঁড়ে পাওয়া গেল মামার শ্রীহস্তাক্ষর, মানে জাস্ট কালোজিরের সাইজের অক্ষরে লেখা নীট আড়াই লাইন চিঠি। তাও সাধুভাষায়।

পুষ্কর, পত্রপাঠ কেবল টুথব্রাশটি বুক-পকেটে ফেলিয়া চলিয়া এস। এই বনবাসে থাকিয়া কয়-দিবস মজা লুটিয়া যাও। আমি কিছুকাল যাবং এখানে আছি।—অশ্বিনীমামা।

ছোট্ট চিঠি, কিন্তু মেজাজটা যেন টেলিগ্রামের। প্রতিটি শব্দ যেন নিক্তি দিয়ে ওজন করে লেখা। যেন পয়সা লেগেছে শব্দ-পিছু। চটে গেলাম অশ্বিনীমামার ওপরে। এ তোমার কি চিঠির ছিরি! কবে এলে, কেন এলে, কোথায় এলে কিচ্ছু নেই! আর

লুটতে তো বলেছো, কিন্তু মজাটা কিসের তা তো বলোনি? ঠিকানা দেখে না হয় বুঝলাম রয়েছো আলিপুর চিড়িয়াখানায়। কিন্তু এ তোমার কি রকম রসিকতা, বাপু! নেমন্তন্ন সেই তো করলে, তা অ্যাদ্দিনে? আর এমন জায়গা থেকে? রাঁচির পাগলা গারদ থেকে করলেই বা কি এমন খারাপটা হতো! যখন উত্তর বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা কি মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল বেধড়ক চষে বেড়াচ্ছিলে তখন মনে পড়েনি এ অধমকে একবারের জন্যেও? হলেই বা নিজের মামা, হলেই বা বনবিভাগের বড় অফিসার তুমি! এটা কিন্তু তোমার মোটেই ভাল কাজ হলো না। খাস কোলকাত্তাই চিড়িয়াখানা থেকে এই যে ভাগনেকে ঠাট্টা করে চিঠি পাঠালে, এ ধর্মে সইবে না। বয়েই গেছে আমার ঐ নেমন্তন্ন রাখতে!

'আবার যকের ধন' বইটা ডেস্কের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উত্তেজিত ভাবে উঠে বসলাম।



॥ ২ ॥

ক্যাঙ্গারুর খাঁচার সামনেই অশ্বিনীমামা আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেললো। আমার হাতে তখন লিলিপুট সাইজের একছড়া কলা। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে ভিজে ছোলা আর চীনেবাদামও রয়েছে। ফটকের কাছে বিক্রী করছিল, কিনেছি। যে দেবতা যাতে তুষ্ট হন, হবেন। রোদ নরম থাকতে থাকতে এক চক্কর পশুদর্শন সেরে নেবো ভেবেছিলাম। পরে মামা-সন্দর্শনে যাওয়া যাবে। তাড়া ছিল না কিছুই। মামার কোয়ার্টার এই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই, ফটকেই খবর নিয়ে রেখেছিলাম।

অশ্বিনীমামা সাহেবসুবো মানুষ। রবিবারের সকালে বেলা করে ঘুম থেকে ওঠাই সাহেবী রেওয়াজ। তা উঠুক ধীরেসুস্থে, বেড-টি খাক, কাগজ-টাগজ পড়ুক, অপিস-টপিসের তাড়া নেই যখন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পেয়ালা চা খাক আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে। আমি ততক্ষণে এক চক্কর মেরে গিয়ে হাজির হবো। তাই ছেলেমেয়েদের ভিড়ে ভিড়ে গিয়ে খাঁচা থেকে খাঁচায় এগোচ্ছিলাম পায়ে পায়ে। এমন সময় ঘটনাটা ঘটলো।

একটা দারুণ চক্রাবক্রা আমেরিকান বুশশার্ট, দুর্ভেদ্য রঙীন চশমা আর রোদ-ঠেকানো শোলার টুপি-পরা একটি মূর্তি চলন্ত বাইকের সীট থেকে ঝুপ করে নেমে পড়লো।

'ওহে মর্কটশ্রেষ্ঠ! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাকে কলা দেখানো হচ্ছে?'

কথা শুনেই চমকে তাকালাম, কারণ আমার হাতে তখন একছড়া লিলিপুট কলা। তাকিয়েই চিনলাম। অপরূপ রূপের আড়ালে আমাদের সেই চির-আমুদে খেয়াল-ক্ষ্যাপা অশ্বিনামামা—যার ওপরে বেশীক্ষণ অভিমান করে থাকা যায় না। গলায় বাইনোকুলার ঝুলছে, মুখে বিঘত সাইজের জ্বলন্ত সীগার এবং তার ঠিক তলাতেই সেই চির-চেনা রহস্যময় হাসিটি। মামার ঠাট্টার ধরনটাই এরকম।

আমি হেসে জবাব দিলাম, 'ছিঃ মামা, মর্কট বলো না, নিজের অপমান হবে। সেই কি একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে না—নরাণাং মাতুলক্রমঃ? ওটা হয়তো বানরাণাং হয়ে যাবে। হাজার হলেও তুমি হচ্ছ অশ্বিনীমাতুল!'

একহাতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে অন্যহাতে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মামা বললো, 'সাবাস! মামার মুখ তুই নিশ্চয় রাখবি, তুই লায়েক হয়েছিস।' তারপর ঠাট্টার স্বর বদলে নরম গলায় শুধালো, 'কতক্ষণ এসেছিস?'

বললাম, 'এই। তোমার চিঠি-মাফিক পত্রপাঠই এসেছি কিন্তু, মামা।'

মামা খুশী হয়ে বললো, 'চল চল, আগে বাংলোয় চল। কত কথা আছে তোর সঙ্গে। কী ভাল লাগছে, তুই এসেছিস!'

মামার কথা শুনে আনন্দ হলো। যাক, মামা অন্ততঃ আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলেনি। বাড়ির কেউ তো আমাকে পাত্তাই দিতে চায় না। নিতান্ত ছেলেমানুষ ভাবে। কিন্তু আমি কি আর সত্যিই ছেলেমানুষ আছি! হলোই বা আমার ষোল বছর তিনমাস বয়স। হায়ার সেকেণ্ডারী তো দিয়েছি, কয়েক মাস পরেই কলেজ। একেবারে ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হবো।

আসলে বড়রা সব সময়েই ছোটদের ছোট ভাবে। মনে করে, আমরা বুঝি কিছুই বুঝি না, কিছুই জানি না। মনে নিশ্চয় ভাবে, আমাদের সাহস নেই, বুদ্ধি নেই। কিন্তু জানে না তো

যে, রাশি রাশি গল্পের বই পড়ে আর গাদা গাদা পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে আমরা আর সেই খোকনটি নেই। অনেক বয়স্ক লোকের সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারি এখন। সেই কোন্ স্কুলের জীবনেই কত কাণ্ড করেছি আমরা চার বন্ধুতে মিলে। ছোটখাট গোয়েন্দাগিরি পর্যন্ত!

মামা তার সাইকেলের ঘাড় ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি পাশে পাশে। মামার মুখখানা দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল, সে কোনো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তাই কথা বললাম না আর। বাংলোটা খুব কাছেই, পৌছে গেলাম মিনিট ছুয়েকের মধ্যেই।

বাড়িটা যে এত সুন্দর হবে আমার কল্পনাই ছিল না। ফিকে হলুদ রঙের আধা দোতলা বাড়ি। কেমন ঠাণ্ডা আর নিশ্চুপ দেখতে। বাগান দিয়ে ঘেরা। বড় বড় গাছের ঘন পাতার নিচে ছাদ। বাড়িটার তিনদিক থেকে মাধবী, বোগেনভিলা আর মধুমালতীর ওড়না গা বেয়ে উঠে গেছে ছাদে। তারই ফাঁকে ফাঁকে গরাদহীন সবুজরঙের জানলাগুলো জেগে আছে। স্বপ্ন-দেখা চোখের মত আধবোজা।

বাড়িটার পিছন দিকে প্রকাণ্ড জলা, মানে পশুশালার লেক। শীতের মরশুমে যেখানে হাজার হাজার অতিথি পাখিরা এসে নামে, খবরের কাগজে পড়েছি। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলাম।

মামার বাংলোর ভেতর ঢুকেই মাথাটা কেমন ঘুরে গেল আমার।

হঠাৎ ফিউজ-হয়ে-যাওয়া আলো-ঝলমলে বাড়ির মত চার-পাঁচ কি কয়েক সেকেণ্ড অন্ধ হয়ে যাবার মত অন্ধকার। সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার আবছা হয়ে এলে পা ঘষটে ঘষটে কয়েক ইঞ্চি এগোলাম। শো আরম্ভ হয়ে যাবার পর সিনেমা হলে হঠাৎ ঢুকলে যেমন হয়।

আমার হাত ধরে টেনে নিতে নিতে মামা বললো, 'ইদিকে

আয়। এত লজ্জা কিসের তোর? মামীকে চিনতে পারছিস না, নাকি মিঠুকে? কত্তো ছোট দেখেছিলি ওকে, মনে আছে তো?'

আমার হারানো দৃষ্টি ফিরে এসেছিল। আবার ঘরের ভেতরকার সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। মাথার অবস্থাটাও ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু কথা বলতে পার্‌ছিলাম না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি একেবারে বোবা করে দিয়েছিল।

সামনে মামী আর মিঠুকে দেখতে পাচ্ছিলাম। চিনতেও পেরেছিলাম ঠিকই। মামার অনুমান মোটেই ঠিক না, একবিন্দুও লজ্জা পাইনি আমি। কথায় কথায় লজ্জিত হবার ছেলে আমি নই।

মা আর মেয়েতে মিলে হাসি-হাসি মুখে বুঝি আমাকেই কিছু বলছিল। কিন্তু ওদের কথা কিছুই আমার কানে ঢুকছিল না। আমার খেয়াল তখন সম্পূর্ণ অন্যদিকে। আমার মনে হচ্ছিল, এ-বাড়ি আমার কাছে নতুন নয়। এর ঘর-বারান্দা ছাদ-সিঁড়ি সব আমার জানা। ভোরে ভুলে-যাওয়া স্বপ্নের মত সব একে একে যেন মনে পড়ে যাচ্ছিল। এখানে আমি নিশ্চয় আগে কখনো ছিলাম। বুঝি একটু আগেই এখানে আমি ছিলাম। এ-বাড়ির দরজা-জানালায়, আসবাবপত্রে যেন আমার একটু আগের হাতের ছোঁয়া লেগে আছে।

এই অনুভূতিটা মুহূর্তে আমাকে কেমন বোকা আর ব্যাকুল করে তুলেছিল। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। যখন চমক ভাঙলো, খেয়াল ফিরে পেলাম, দেখি মামা আমাকে ধরে সোফার ওপরে বসিয়ে দিচ্ছে, আর-হাঃ হাঃ করে হাসছে।

'তোর হলো কী রে?' হাসি থামিয়ে মামা অবশেষে বললো।

আমি কেমন ভয়-পাওয়া দুর্বল গলায় বললাম, 'মামা, এখানে, মানে এ-বাড়িতে হয়তো আমি আগে কখনো ছিলাম। এই ঘরটার ভীষণ চেনা লাগছে আমার।'

কথাটা বলে ফেলেই কেমন থতমত খেলাম, নিজের কানেই

সেটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য আর হাস্যকর ঠেকলো। মনে পড়লো, এর আগে তিনবার এই চিড়িয়াখানায় আমি এসেছি, কিন্তু কোনো বারই পশুপাখির খাঁচার সামনে ছাড়া বিশেষ কোথাও যাইনি। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের এই বাংলোবাড়ি তো কল্পনার বাইরে ছিল।

ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলো মামা; বললো, 'ছিলে। তবে আগের জন্মে ছিলে, বুঝেছ?'

বুঝলাম মামার কথার ভেতরের অর্থটা। বুঝে লজ্জা পেলাম, বিশেষ করে মামী আর মিঠুও একসঙ্গে হেসে ওঠায়। কিন্তু ওরা কি বুঝবে আমার মনের অবস্থা! আমি তো বানিয়ে বলিনি। যেমন চোখের আড়ালে কেউ হয়তো তামাক খাচ্ছে—ব্যাপারটা চোখে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু গন্ধটা তো আর গোপন থাকছে না। স্পষ্টই নাকে এসে পৌঁচচ্ছে, আমার অনুভূতিটাও এই রকমের জীবন্ত সত্যি। অনুমান করা যায়, প্রমাণ করা যায় না।

কিন্তু এ-বিষয়ে আর কিছু বলতে সাহস করলাম না। শেষে মামা না জানি আরও কি ঠাট্টা করে বসবে! আমি তাড়াতাড়ি মিঠুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম।

'আরেব্বাস্ মিঠু! কত বড় হয়ে গেছিস তুই? প্রথমে রাস্তায় দেখলে বুঝি চিনতেই পারতাম না তোকে!'

মিঠু কিছু বলার আগেই মামী হেসে জবাব দিল, 'আর তোকেই বুঝি খুব চেনা যেত? ছিলি পুঁচকে ছোঁড়া, পুপে বলে ডাকতাম, আর এখন মামার মাথায়-মাথায়! তোর গলার স্বরটা পর্যন্ত কেমন পাল্টে গেছে—হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, কে না জানি লোকটা!'

মামী একটু মোলায়েম করেই যে আমার রূপ বর্ণনা করলো, বুঝতে পারলাম।

কারণ আমার গলার স্বর কেবল পাল্টে যায়নি, রীতিমত যাকে বলে হেঁড়ে হয়েছে। কথা বলতে শুরু করলে মনে হয়, দু'তিনজন

একসঙ্গে কথা বলছে দু'তিন রকম গলায়। নতুন পিসেমশায় চন্দননগরের বাড়িতে টেপ-রেকর্ডার এনেছিলেন, তাতে কথা বলে শুনেছি। আর ঠোঁটের ওপর নতুন গোঁফের চাষ হয়েছে। লুকিয়ে একদিন আবার রেজারও ঘষেছিলাম, তারই সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ নীলরেখা দেখা দিয়েছে।

মামা হঠাৎ সোফা থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললো, 'বেশ, তোমরা তাহলে গল্প-টল্প করো, আমি চলি, অনেক কাজ পড়ে আছে—'

যে কথা সেই কাজ। কথা শেষ হবার আগেই ব্যস্তসমস্ত অশ্বিনীমামা বসবার ঘর থেকে উধাও। মামী জানালায় ছুটে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরো, বাপু। পুপে এল কদ্দিন বাদ—'

বাগান থেকে মামার অদ্ভুত সম্মতির ধ্বনি শোনা গেল, 'হুম্ !'

শুনলাম, রবিবারেও অফিস খোলা মামার। তার ওপর বছর-শেষের উটকো কাজ চেপেছে। এমনিতেই মামা কাজ-পাগলা-লোক, একটার জায়গায় দশটা কাজ জুটিয়ে বসে নাওয়া-খাওয়ার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সকাল থেকে বাগানে চক্কর, তারপর অফিস। অফিস মানেই টেলিফোন-ফাইল-সাক্ষাৎকার। চিঠিপত্রের জবাব লেখা, মিটিং-ফিটিং লেগেই আছে। লাঞ্চের পরে আবার অফিস, অফিস-শেষে আবার বাগান। পশুপাখির দানাপানি থেকে গাছপালার পরিচর্যা ঠিকমত হচ্ছে কিনা তার সরেজমিন তদন্ত।

॥

মামী খাওয়াতে ভীষণ—ভীষণ ভালোবাসে।

তেমনি ভালোবাসে নিত্যনতুন রান্নার পরীক্ষা চালাতে। কিন্তু খাওয়া দূরে থাকুক, সে রান্না চাখবারও লোক জোটে না এ-বাড়িতে সব সময়। মামীর মনে তাই ভারী দুঃখ। এক কাপ দুধ খাওয়াতে যার পিছু পিছু এ-ঘর ও-ঘর সেধে বেড়াতে হয়, সেই মিঠুর আশা মামী ছেড়েই দিয়েছে। বাকি রইলো মামা। সে মামাও স্বল্লাহারী মানুষ, খাওয়াদাওয়ায় ভারী খুঁতখুঁতে। এটা খাবো না, সেটা খাবো না লেগেই আছে। মামী তাও পেড়াপেড়ি করলে মামা বিদ্রোহ করে বসে সময় সময়। বলে, 'আমি কি তোমার চুলোর এক্সপেরিমেন্টের হিউম্যান গিনিপিগ, আই মীন মনুষ্যরূপী ছাগল যে, চব্বিশ ঘণ্টা চর্বন করতে লেগেই থাকবো? বেশ, খাওয়াতে যদি এতই সাধ তোমার, দাঁড়াও পুপেকে আনছি।'

মিঠু হাসতে হাসতে আমাকে ঘটনাটা বলছিল। এর ফলেই নাকি আমাকে মামার আড়াই ছত্রের চিঠি লেখা। যদিও আমার নিজের মনে হলো, ওটাই কিছু একমাত্র কারণ না আমাকে এখানে আনার, আরও ব্যাপার-স্যাপার আছে।

অবিশ্যি মামার ধারণায় যে কোথাও ভুল নেই, সর্বভুক্ খাদক হিসেবে আমি যে নির্ভরযোগ্য, হাতে মুখে তার প্রমাণ দিলাম অশ্বিনীমামা বেরিয়ে যাবার আধঘণ্টার ভেতরেই। গোটা দুই

ভারী ভারী ডিশ আর একমগ ঠাণ্ডা কফি শেষ করে আমি যখন মুখ তুললাম, দেখি মামী মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'পুপে, তোকে বাবা একমাসের আগে এখান থেকে ছাড়চিনে।'

মিঠু এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরে ছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে মামীকে বললো, 'পুপে দাদাকে এবার একটুক্ষণের জন্যে ছাড়ো তো মা, আমার দরকার আছে।'

মামী মেয়ের দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'তোমার পুপেদাকে আমি কি ধরে রেখেছি বাছা, না বেঁধে রেখেছি? তোমরা বাপে-বেটিতে ওকে নিয়ে যা খুশী করো, আমার ভারি বয়ে গেছে।' মামী খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ে সশব্দে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মামীর এই রাগ যে সত্যিকারের রাগ নয়, মিঠু বোধহয় বুঝতে পেরে গেছিল। তাই মায়ের অলক্ষ্যে একটু মুচকি হেসে ভেংচি কাটলো সে। আসলে মিঠু মামা-মামীর কেবল আদরের মেয়েই নয়, ওদের একমাত্র মেয়ে। মানে একমাত্র সন্তান। যেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মত রঙ মিঠুর, তেমনি প্রজাপতির মত ঝকমকে চেহারা। শুধু কি রূপেই মিঠু সকলের আদরের? গুণেও। লেখায়, পড়ায়, আঁকায় সে বেজায় ভালো। এই বয়সেই ইংরেজিতে কি চমৎকার কথা বলতে পারে। হবেই বা না কেন, কনভেন্টে পড়ে তো!

যতদিন মামা-মামী বাইরে বনবাসী ছিল, বনবিভাগের চাকরিতে এক জঙ্গল থেকে আর এক- জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ততদিন মিঠু কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছে। এখন এই কিছুদিন হলো, মামা কলকাতার চিড়িয়াখানায় বদলি হয়ে আসায় মিঠু হোস্টেল ছেড়েছে, এখন সে মা-বাবার সঙ্গেই থাকে। তাই আদর বোধ করি আর একদফা বেশী।

মিঠু আমাকে নিয়ে সোজা দোতলার একটি ঘরে এসে দাঁড়ালো।

বললো, 'এই ঘরটি তোমার, পুপেদা। আগে থেকেই আমাদের ঠিক করা আছে। কি, তোমার পছন্দ হয় তো?'

পছন্দ না হবার কোনো প্রশ্নই আসে না। ছোট হলেও ঘরখানা সত্যি সুন্দর। এবং আমার ভীষণ চেনা। একপাশে নিচু খাটের বিছানা, অন্যপাশে আয়না-বসানো ছোট্ট লেখার টেবিল। খান দুই চেয়ার আর বইভর্তি একটা বুক শেল্‌ফ—ঠিক যেন খাবার-ঠাসা মীটকেস। ভারী ভাল লাগলো। এবং গল্পের বই পড়ি আর না পড়ি, হাতের কাছে সাজানো থাকলে আমার খুব ভাল লাগে। দু'দিকে দু'টি বড় বড় জানালা। একটি দিয়ে ঝিল দেখা যায়, অন্যটি দিয়ে বড় বড় গাছের মাথা ডিঙিয়ে নীল আকাশ। এখন চারপাশ রোদে ঝলসাচ্ছে। একটা শিমুলগাছের ডালে বসে শঙ্খচিল ডাকছে থেকে থেকে।

মনে কেমন অদ্ভুত একটা স্বস্তি পেলাম। যেন একেবারে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। কলকাতার মধ্যে এমন নিরিবিলি নির্জনতা সত্যি দুর্লভ। আমি যেন কতদিন পরে এই দুর্লভ জায়গায় আবার ফিরে এসেছি।

'এসো, আরও দেখাই।' মিঠু দেওয়াল-আলমারিটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো।

আমি বললাম, 'দেখাতে হবে না রে, এ ঘর আমার জানা, ওটা তো ওয়ার্ডরোব। তাই না? আর ওপাশের ছোট একপাল্লার দরজাটা অ্যাটাচড্ বাথরুমের। খুব পছন্দ আমার এই ঘর।'

মিঠু আমার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'সত্যি পুপেদা? কি করে জানলে?'

প্রশ্নটা আমারও। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'কী জানি। আমার মন বলছে, জানি। আচ্ছা মিলিয়ে ভাখ, বাথরুমটা মোজায়েক করা। তাই কি?'

মিঠুর মুখখানা ইঞ্চি দুই ফাঁক হয়ে গেল। তা দেখেই বুঝলাম, বাথরুমের ব্যাপারটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এ-বাড়ির ঘরগুলো

কোনোটাই মোজায়েক করা নয়, তাই বাথরুমের ব্যাপারটা আমার অনুমান করবার কথা নয়। কিন্তু আমি যেন একটু আগেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছি, চোখ বুজলেই ভেতরটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

'বলো তো কি ডিজাইনের মোজাইক! টাইলস্ বসানো, না প্লেন?' মিঠু বেশ উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন করে।

আমি চোখ বুজেই ছিলাম। বললাম, 'না, টাইলস্ বসানো না। কোনো ডিজাইনও না। হালকা লাল রঙের ওপরে কালো আর সাদা বুঁটি। বর্ডার ফিকে সবুজের জমিতে সাদা আর হলুদ পাথরের দানা জমানো।'

বলেই চোখ খুললাম, তারপর মিঠুর উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেললাম। ইচ্ছে, নিজের মনকে হাতেনাতে যাচাই করে দেখা। এটা আমার মনের নিছক কল্পনাও হতে পারে, একটা ছুটো মিলেছে বলে যে সবগুলোই মিলবে, তার কোনো কথা নেই। কিন্তু দরজা খুলে এবার আমি নিজেই হাঁ হয়ে গেলাম। যা যা বলেছি, একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি! উত্তেজনায়, আনন্দে এবং কেমন একরকম গা ছমছম-করা ভয়ে আমি প্রায় কেঁদে ফেললাম, 'মিঠু রে, এ কি করে সম্ভব?'

মিঠু ছুটে এসে আমাকে তু'হাতে জড়িয়ে ধরলো, 'পুপেদা, তুমি নিশ্চয় ম্যাজিক জানো। আমাকে শেখাতে হবে এটা—'

আমি যত ওকে বোঝাই, ম্যাজিক-ফ্যাজিক আমি জানি না, জীবনে কখনো ম্যাজিক দেখিইনি: সার্কাস দেখেছি, সিনেমা দেখেছি, কুস্তি-বক্সিং-জুজুৎসুও দেখেছি, কিন্তু ম্যাজিক না, ও ততই অবুঝের মত আবদার জানাতে থাকে, এই একটা ম্যাজিক শিখিয়ে দিলেই ও সারাজীবন কেনা গোলাম হয়ে থাকবে আমার কাছে। আর বেশী কিছু চায় না।

একা ছাদে বসেছিলাম। ছাদ থেকে চিড়িয়াখানার দৃশ্যটা অপূর্ব।

কিন্তু আমার মন সেদিকে ছিল না। সূর্য ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা চিন্তা আমার মনকে ঘিরে ধরেছিল।

অশ্বিনীমামা কি কাজে ধর্মতলায় গেছে। মামী তার খাস পদ্মাপারের সাকরেদ জলধরকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকেছে। তার মানে রীতিমত স্পেশাল একটা কিছু সেখানে তৈরি হচ্ছে। রাতে খাবার টেবিলে সকলকে চমকে দেবার জন্যে।

মিঠুর কাল সকালে স্কুল। তার ওপর সামনে হাফ-ইয়ারলি। দুই তরফের পড়া নিয়ে সে বেজায় ব্যস্ত। নইলে আমার সঙ্গ সে এত সহজে ছাড়তো না।

কিন্তু মিঠু আমার সঙ্গ ছাড়লেও মিঠুর দুপুরবেলার সেই প্রশ্নটা আমাকে এখনও ছাড়েনি। বিকেল-শেষের এই একলা ছাদেও সে প্রশ্ন কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মগজে—'কি করে জানলে ?'

কি করে জানলাম, আমি নিজেই কি ছাই জানি!

মিঠুকে পরে একসময় বলেছিলাম, 'তুই পূর্বজন্ম মানিস ?'

মিঠু প্রশ্ন করেছিল, 'কেন ?'

আমি বলেছিলাম, 'মামা ঠাট্টা করে কথাটা বললেও আমার কিন্তু খুব মনে ধরেছে, মিঠু।'

'কোন্ কথাটার কথা বলছো ?'

'ওই যে সকালবেলায় মামা বললো, শুনিসনি ? বলেছিল—ছিলে, তবে আগের জন্মে ছিলে, বুঝেছ ? মনে পড়লো ?'

মিঠু ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, 'ওঃ, হ্যাঁ!'

'এ-ছাড়া সত্যিই কোনো উত্তর নেই কিন্তু। আমি যখন ম্যাজিশিয়ান নই, এ জন্মে যখন এ-বাড়িতে কখনো পা দিইনি এর আগে, তখন এমন হবার মানে কি ? হয়তো আগের জন্মে আমি তোর মতই এ-বাড়িতে অনেকদিন বাস করেছি। সে-জন্মের আর সব কথা ভুলে গেছি, কিন্তু বাড়িটার স্মৃতি এখনো সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে যায়নি। এ-বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে।'

'তুমি কি তাহলে জাতিস্মর? পূর্বজন্মের কথা যাদের মনে থাকে তাদের তো জাতিস্মর বলে?'

'হ্যাঁ, বলে। কিন্তু আমি জাতিস্মর নই। হলে পূর্বজন্মের অনেক কথাই মনে পড়তো। আমার তো কিছুই মনে পড়ে না—সে-জন্মে আমি কি ছিলাম, কে ছিলাম, কাদের সঙ্গে ছিলাম? শুধু এই বাড়িটা আমার চেনা লাগছে, ব্যস, আর কিছু না। ভেবে দেখলে এই বাড়িটার কথাও মনে পড়েনি—শুধু চেনা লাগছে। যেন কোনো পড়া গল্পের বই—ভুলে গিয়েছিলাম, আবার পড়তে গিয়ে কেমন জানা মনে হচ্ছে। এমনটা কি একেবারেই অসম্ভব?'

মিঠুর মুখচোখের চেহারা খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছিল। সে জোরালো গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'না। কেন অসম্ভব? এই তো ক'মাস আগে খবর কাগজে একটি ছোট মেয়ের কথা বেরিয়েছিল, পড়োনি? সে মেয়েটা তার আগের জীবনের অনেক কথা বলে দিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে সেই আগের জন্মের বাড়িঘর আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। তবে তোমারটাই বা এত আশ্চর্যের কি, পুপেদা! হতেও পারে'।

আমি কেমন দার্শনিকের মত কথা বলছিলাম, 'ক'দিনেরই বা কথা। এখন আমার বয়স ষোল বছর তিনমাস। মরার বছর দুয়েকের মধ্যেই যদি ফের জন্মে থাকি, তাহলে তো মাত্র আঠার-উনিশ বছর আগের কথা। মনে থাকা কি খুব কঠিন? এই জীবনে যদি চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের কথা স্পষ্ট মনে থাকে, তবে মরবার আঠার-উনিশ বছরের মধ্যেই স্মৃতি বিলকুল ভ্যানিশ হয়ে নাও তো যেতে পারে। আসল কথা, তুই কি পূর্বজন্ম মানিস?'

এবারও মিঠু সরাসরি কোনো উত্তর দেয়নি। অন্যমনস্কভাবে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'আমার কেমন মনে হয়, পুপেদা, মানুষ মরে আবার জন্মায়, আবার ফিরে

আসে। রূপকথার গল্পগুলো কখনো মিথ্যে হতে পারে না। আমরা কেউ মৃত্যুর পর ফুরিয়ে যাই না, হয়তো হারিয়ে যাই মাত্র। লুকোচুরি খেলার মত। অন্যেরা দেখতে পায় না, তাই খুঁজে পায় না, নিজেরাও হয়তো নিজেকে হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই।'

ভাবছিলাম। মিঠুর কথাটাই ভাবছিলাম। জন্মান্তর নিশ্চয়ই আছে। ধর্মগ্রন্থে আছে, সায়েন্সেও তো বলেছে, এভলিউশন। গাছ, মাছ, পাখি, সরীসৃপ, মেরুদণ্ডী প্রাণী, তার পরে মানুষ। আরও স্পষ্ট করে—বানর থেকে নর। কোটি কোটি বছরের সিঁড়ি ভেঙে প্রাণ উঠে এসেছে সবচেয়ে উঁচুতলার জীবনে—অর্থাৎ মানুষ হয়ে দেখা দিয়েছে, শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে।

এইসব তত্ত্বকথা ভাবতে গিয়ে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, ঝিমঝিম করছিল মাথাটা। এমন সময় ঝিলের ওপরের আকাশ থেকে শেষ রঙটুকু খসে পড়ে গেল। বড় বড় গাছের মাথাগুলো হঠাৎ কালো ছাতার মত অন্ধকার হয়ে গেল।

চাঁদ উঠতে বোধহয় এখনো মিনিট চল্লিশ দেরি আছে। পূর্ণিমার পরে চাঁদ ক্রমশঃ দেরি করে ওঠে। বাগান জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। দর্শকরা বিদায় নিয়েছে অনেকক্ষণ। মালী এবং দারোয়ানেরাও আপাততঃ সরে পড়েছে।

ছাদ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, জ্যালজেলে অন্ধকারের মধ্যে ছোট বড় গাছের জটলা, জলাভূমি আর জন্তু-জানোয়ারদের বিচ্ছিন্ন নীরব ডেরাগুলি যেন স্থির হয়ে আছে। দিনান্তে জড়ো হওয়া পাখিদের ঝটাপটি কিচিমিচি থেমে গেছে, এখন ঝিঁঝির ডাক আর কদাচিৎ দু'চারটে পাখসাট শোনা যাচ্ছে। দিনের আলোয় যা বাগান, রাতের আঁধারে তাই বন।

ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হলো, নিচের বাগান থেকে কেউ আমাকে দেখছে। সেদিকে ভাল করে তাকাতেই লোকটা একটা ঝোপের মধ্যে বসে পড়লো। আর দেখা

গেল না। লোকটা কে, আমাকে কেন দেখছিল জানার জন্যে ভাবলাম তাড়াতাড়ি নিচে নামি। আমি এ বাড়িতে নতুন এসেছি সত্যি, কিন্তু তাই বলে আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখার কিছু নেই। আর এভাবে গা ঢাকা দেবার একটাই মানে হয়, লোকটার মনে নিশ্চয় কোনো মতলব আছে। চোর-টোর নয় তো!

নিচে নেমে আসার সময় ঘর থেকে আমার শখের পেন্সিল-টর্চটা সঙ্গে নিয়েছিলাম। কারণ বাগানের স্ট্রীট লাইটগুলো তখনও জ্বলেনি দেখেছিলাম। কিন্তু বাগানে সেই নির্দিষ্ট ঝোপটির কাছে গিয়ে দেখলাম, পাখি উড়ে গেছে, ঝোপের ভেতরটা ফাঁকা। টর্চের আলো ফেলে ভাল করে লক্ষ্য করতেই একটা ধূমায়িত জিনিস পড়ে থাকতে দেখলাম। একটা বিড়ির টুকরো, আগুন তখনো নেভেনি।

সেকেণ্ড কয়েক বোকার মত সেদিকে তাকিয়ে থেকে সরে এলাম। এই তুচ্ছ ব্যাপার মন থেকে জোর করে ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে চললাম। আমাদের বাংলোর বাগান পার হয়ে চিড়িয়াখানার খাস বাগানে পড়লাম।

স্যাংচুয়ারি বা প্রাণী-নিবাসের কথা শুধু খবরের কাগজে আর বইতেই পড়েছি। জীবজন্তুর শিকারের কাহিনী শুধু শিকারের গল্পের বইয়েই। চোখে দেখিনি কখনো। মনে হলো, এই বা মন্দ কি? নাই বা হলো এটা আসল বন কিংবা আদৌ বন। নাই বা হলো এরা বনের স্বাধীন জন্তু-জানোয়ার। বনের খাঁচায় পোরা বাঘ সিংহ গণ্ডার হাতি জলহাতি জিরাফের মাঝখানে একা একা ঘুরে বেড়ানো এবং রাত্রিবাস—এই বা কম কিসে? নকল বনবাসের রোমাঞ্চও কিছু কম নয়, এই ছমছমে অন্ধকারে আমার অন্ততঃ তাই মনে হলো।

ঘুরছিলাম এলোমেলো পায়ে, উদ্দেশ্যবিহীন। কিছু ঠিক দেখবার জন্যে নয়। কোনো পশুপাখির খাঁচার সামনেই তাই দাঁড়াচ্ছিলাম না। একটু পরে ইলেকট্রিক বাতিগুলো জ্বলে

উঠলো। তবু অন্ধকার দাঁড়িয়েই থাকলো, পালালো না। কারণ পশুশালার বাগানে অধিকাংশ জায়গাতেই আলো নেই। যেখানে নিতান্ত প্রয়োজনের খাতিরে আছে, সেখানেও বেশ কম পাওয়ারের ঝাপসা আলো। বেশীর ভাগই গাছপালার ডালপাতার ঘেরাটোপে ঢাকা, দূর থেকে সব সময় নজরে আসে না। এ যেন জঙ্গলের ব্ল্যাক আউট।

তেঁতুল, শিরীষ, মুচকুন্দ, দেবদারু ইত্যাদি নানা জাতের বড় বড় গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, কিছু উটকো প্রাণী চোরাগোপ্তা চলছে ফিরছে। তারা এখানকার খাঁচায় পোরা বাসিন্দা নয়, সরকারী খাতায় তাদের নাম নেই, রেশনকার্ড নেই। দিনের বেলায় মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। রাতের বেলায় চরতে বেরোয় কিংবা শান্তিতে ঘুমোয়। ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন অনেকটা দূরে এসে পড়েছিলাম। বাংলো আর স্বর্ণময়ীভবনের কাছাকাছি দু-একজন পাহারাওয়ালা দারোয়ানের সঙ্গে যা-ও বা দেখা হয়েছিল, এ দিকটা একেবারেই জনমানবশূন্য।

ঘুরতে ঘুরতে লেকটার একেবারে অন্যপাশে এসে পড়েছি। সামনে গুটি দুই খাঁচাকুঠরি, তারপরে এদিককার সীমানা শেষ, খাড়া প্রাচীর উঠেছে। সামনে দু'একটা ঝুপসী গাছের ছাতার তলায় অন্ধকারটা বেশ নীরেট, চোখ চলে না। ইতিমধ্যে চাঁদ উঠলেও তার ফিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে আর একটু তফাতে।

গা-টা হঠাৎ কেমন ভারী বোধ হতেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কেমন মনে হলো, আর এক পা এগোলেই বিপদে পড়বো। কি বিপদ জানি না, কিন্তু সে যে আমার জন্যেই এবং খুব কাছেই কোথাও ওতে পেতে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। একেই হয়তো বলে অবচেতন অনুভূতি। কিন্তু এই অনুভূতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাছেই আবার একটা খসখস শব্দ শোনা গেল।

একটু আগেই যে খসখস শব্দটা হচ্ছিল, আমি দাঁড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা থেমে গিয়েছিল। বুক-পকেট থেকে টর্চটা নিয়ে আমি সেইদিকে ফোকাস করলাম। কিন্তু টর্চের ব্যাটারির অবস্থা যে এত শোচনীয় হয়ে আছে, কিছুক্ষণ আগেও বুঝতে পারিনি।

খুব দুর্বল, ম্যাটমেটে এক আঁজলা আলো হাত তিনেক গিয়েই ভ্যানিশ হয়ে গেল। সে আলোয় কিছুই চোখে পড়লো না। ফিরে যাবো ভাবছি, এমন সময় কাছেই কোথাও একটা বাচ্চা ছেলে তীক্ষ্ণ গলায় কেঁদে উঠলো। সেই কান্না মিলিয়ে যেতে না যেতেই হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ করে কারা যেন মুচড়ে মুচড়ে হেসে উঠলো একসঙ্গে।

বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল সেই আঁতুড়ে-কান্না শুনেই, এবার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট দিলাম। কিন্তু কতটা যে দৌড়ে যেতে পেরেছিলাম হুঁশ ছিল না। আমার ঘাড়ের ওপর কেউ লাফিয়ে পড়লো আচমকা।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে আমি একবার শুধু প্রাণপণে চিৎকার দিলাম।

॥ ৪ ॥

চোখ চেয়ে দেখি, অশ্বিনীমামা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ভেবে, আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে গেলাম, কিন্তু মামা আমাকে জোর করে আবার শুইয়ে দিল।

বাংলোর দোতলায় আমার ঘরে শুয়ে আছি দেখতে পাচ্ছিলাম। খাটের ওপর একপাশে মামী বসে ছিল। আমাকে চোখ চাইতে এবং উঠে বসার চেষ্টা করতে দেখে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'পুপে, এখন কেমন আছিস, বাবা?'

মামা দেখলাম চোখের ইশারায় মামীকে থামিয়ে দিল, মিঠুর দিকে চোখ পড়লো এতক্ষণে। সে করুণ মুখ করে আমার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে।

বোকার মত এদিক ওদিক চেয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, 'আমার কি হয়েছে? আমি এভাবে কেন শুয়ে আছি, মামা?'

মামা হেসে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলো, 'আরে ধুর, কিস্সু হয়নি তোর। শরীরটা দুর্বল বলে শুয়ে আছিস এখন।'

মামার কথায় কিছুই স্পষ্ট হলো না, তাই জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, 'কিন্তু—'

আমার মনের কথা টের পেয়ে গিয়ে মামা বললো, 'লেকের ধারে বোধহয় ভয়-টয় পেয়ে সেন্সলেস্ হয়ে গিয়েছিলি! আমরা

খবর পেয়ে তোকে নিয়ে এসেছি। গায়ে কোথাও পড়ে গিয়ে চোট খাসনি তো ?'

না, শরীরে কোথাও বেদনা ছিল না। একটু নড়াচড়া করে দেখে নিয়ে জানালাম সে কথা। তারপরেই হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত সন্ধ্যেরাতের সেই বিভীষিকা মনে পড়ে গেল, শিউরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। ভালোয় ভালোয় এ-যাত্রা ফিরে এসেছি এই ভাগ্য। মামা তাড়াতাড়ি আরও ঝুঁকে পড়ে শুধালো, 'কি রে, কি হলো ?'

বাঙাল জলধর সব সময় দাঁত বের করেই আছে, সেই মূর্তিতেই সে একগ্লাস গরম দুধ নিয়ে আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো। মামী হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিয়ে ধরলো আমার মুখের কাছে। যেন শিশুর মুখে ফিডিং বট্‌ল ধরছে। লজ্জায় এবং অস্বস্তিতে আমি হুড়মুড়িয়ে উঠে বসলাম। মামা গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে আমাকে দুধটা খেয়ে নিতে বললো।

গরম দুধের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমার ঘটনা আনুপূর্বিক বললাম। মামী আর মিঠু চোখ বড় বড় করে শুনছিল। কাহিনী শেষ হতেই মামা হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'দূর বোকা ছেলে! মিছিমিছি কেমন ভয় পেয়ে গেলি ?'

'কেন, মিছিমিছি কেন বলছ ?' আমি আহত গলায় প্রতিবাদ জানাই।

মামা তখনো থেকে থেকে আপন মনে হাসছিল। বললো, 'মিছিমিছি নয় তো কি ? বাচ্চা ছেলের যে কান্না শুনেছিস, ওটা উদ্‌বেড়ালের বাচ্চার চিংকার। আর হাসি ? তুই যেখানে গিয়ে পড়েছিলি, দিনের বেলায় গিয়ে দেখিস, ওখানেই হায়েনার খাঁচা। দু-দুটো হায়েনা ওখানে আছে। হায়েনারা যে মানুষের মত গলা ফাটিয়ে হাসে, বইতে নিশ্চয় পড়েছিস !'

এতবড় ভয়ের ঘটনাটা কিস্‌সু নয় বলে নস্যাৎ করে দেওয়ায় এবং প্রমাণ সমেত ব্যাখ্যা করায় আমি কেমন সঙ্কুচিত বোধ

করছিলাম। আমার মত ভীরু কাপুরুষ বোধ করি বাংলাদেশে দুটো নেই! ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাই, ব্যাঙের ডাকে আঁতকে উঠি, অকারণে এত কাণ্ড করে সকলকে ব্যস্ত করে তোলায় খুবই লজ্জা হলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়তেই হেঁট মাথা আবার তুলে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু তাহলে আমার ঘাড়ে কে লাফিয়ে পড়েছিল? সেটা তো আর মিছিমিছি নয়!'

অশ্বিন মামা প্রাণপণে হাসি চেপে বললো, 'না, তা অবশ্য নয়।' তারপর একটু কি ভেবে বললো, 'আচ্ছা, একটা ব্যাপার দেখাই।'

কথাটা বলেই অশ্বিন মামা ছেলেছোকরাদের মত মুখে আঙুল পুরে দু'বার তীক্ষ্ণ শিস্ দিল। কয়েক সেকেণ্ড কোনো কথা নেই কারো মুখে। মামা আবার আগের মত দু'বার শিস দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খোলা জানালায় ঝুপ করে একটা শব্দ হলো। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, গরাদেশূন্য জানালার তাকের ওপর একটি কদাকার বাঁটুল মূর্তি এসে দাঁড়িয়ে জুলজুল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। লম্বা হাত দু'খানা হাঁটু ছাড়িয়ে পায়ের পাতার দিকে ঝুলছে, গায়ে লালচে রঙের লোম। মুখের চেহারা আর টলমলে দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঠিক সার্কাসের বেঁটে [illegible]নর মত।

'পুপে, তুই কি কল্পনাও [illegible] পারিস, এই ব্যাটাই তোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল!'

আমি সন্দিগ্ধ গলায় বললাম, 'কেন?'

মামা সহাস্যে বললে, 'স্রেফ মজা করবার জন্যে, তুই ওর পরিচিত কিনা!'

এই উল্লুকটা কি করে আমার পরিচিত হলো, আমি তো একে এই প্রথম দেখছি! আমার মনের কথা মামা টের পেয়ে বললো, 'তুই প্রথম যখন এ-বাড়িতে ঢুকেছিস, তখনই ও তোকে ভালো করে লক্ষ্য করেছে গাছের ডালে বসে। লেকের ধারে তুই অজ্ঞান হয়ে গেলে তোর টর্চ, নোটবুক আর রুমাল নিয়ে এসে তোর মামীর কাছে জমা দিয়ে বাহাদুরি নিচ্ছিল, এমন সময় আমি ধর্মতলা থেকে

ফিরে আসি।—ওরে ব্যাটা, জানলায় দাঁড়িয়ে পিটপিটিয়ে দেখছিস কি, খেলা দেখা খোকাবাবুকে!'

মামার কথা শুনে মামী মুখে আঁচল দিয়ে হাসছিল। সেই অপমূর্তিটি এবার আচমকা একলাফে খাট-বিছানা সুদ্ধু আমাকে ডিঙিয়ে একেবারে মেঝের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর জিমন্যাস্টের মত ক্রমাগত ডিগবাজি খেল, মাতালদের মত হেঁটে বেড়ালো। শেল্‌ফ থেকে বই বগলদাবা করে হুপ্ হুপিয়ে ইস্কুল যাওয়া দেখালো। মামার মুখ থেকে আধ-খাওয়া চুরুটটা চেয়ে নিয়ে চেয়ারের ওপর ঠ্যাঙে ঠ্যাঙ তুলে বসে মৌজ করে ধূমপান করলো। সবশেষে আমার সামনে এসে একটা ইয়াবড় সেলুট ঠুকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মামা বললে 'প্সপে, তোর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করতে চাইছে!'

আমি ওর হাতে হাত দিতেই করমর্দন সেরে খোলা জানালাপথে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল আবার।

মামার মুখে তখন ওর পরিচয় জানতে পারলাম। এটি জাতে একটি উল্লুক, যাকে বলে ওরাংওটাং। মানে এক ধরনের ল্যাজহীন ক্ষুদে বাঁদর। আসামের কাজিরাঙ্গা বন্য প্রাণী-নিবাসে মামা যখন ছিল, তখন এক কাষ্ঠের ব্যবসায়ী এটি উপহার দেয় মামাকে। সেই বাচ্চা বয়স থেকে ও মামার সঙ্গে সঙ্গে আছে। মামা ওর নাম রেখেছে উৎফুল্ল।

গরম দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলাম আমি। রাত হয়ে গিয়েছিল। একটু পরে খাবার টেবিলে জমিয়ে বসে রাতের খাওয়া সারতে সারতে আমরা মামার মুখে কাজিরাঙ্গার গল্প শুনছিলাম। মামার অরণ্য জীবনের অভিজ্ঞতা বড় বিচিত্র। এই বয়সেই মামা অনেক দেখেছে, শুনেছে। বন্য পশুপাখির বিষয়ে কৌতূহল এবং জ্ঞানও বিস্তর। সেই সঙ্গে জমাটি করে গল্প বলে যাওয়ার ক্ষমতা আছে অশ্বিনীমামার।

আসামের মধ্যদেশে মিকির পাহাড়, তার উত্তর দিকে ব্রহ্মপুত্র

নদ, তার দক্ষিণ পারে প্রায় মাইল পঁচিশ জঙ্গলে জায়গা নিয়ে কাজিরাঙ্গা। মামা হাতীতে চড়ে প্রায়ই অতিথিদের নিয়ে প্রাণী-নিবাসের জীবজন্তুদের, বিশেষ করে গণ্ডার দেখতে বেরোতো। গণ্ডারের জন্য কাজিরাঙ্গা ছিল বিখ্যাত। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার—কথাটা নিশ্চয় শুনেছ ?

আগেকার দিনের রাজারাজড়ারা এবং দিগ্বিজয়ী বীরের দল গণ্ডার শিকারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ইতিহাসের স্মৃতিকথায় এরকম মজাদার কাহিনী অনেক পাওয়া যায়। যেমন তৈমুরলঙের কিংবা বাবরের নাম করলে তোমরা সকলেই লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু তোমরা কি জানো, ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীর অঞ্চলে তোমাদের ছেলেবেলা থেকে চেনা তৈমুর অনেক গণ্ডার মেরেছিলেন ? শুধু ভাণ্ডারই তিনি লোটেননি। সিন্ধুনদের সমতলে বাবর ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে গণ্ডার শিকার করেছিলেন। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম পাঠানো হয়েছিল ভারতীয় গণ্ডার। যেমন আমাদের আজকের দিনের জাতীয় পক্ষী ময়ূর কোন অতীতকালেই ছড়িয়ে পড়েছিল এসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকা মহাদেশে। ইতিহাসে আছে, শৌর্য এবং সৌন্দর্যের যুগলমূর্তি এই পাখিটি আলেকজাণ্ডারের খুব পছন্দ হয়েছিল। প্রায় ২০০টি ময়ূর তিনি ভারত থেকে সংগ্রহ করে গ্রীসে পাঠিয়েছিলেন।

মামা নিজেও দু'টি ময়ূর পুষেছিল। সেটা ওড়িষার জঙ্গলে থাকাকালে। এদিকে গণ্ডার ধরার রোমাঞ্চকর গল্প বলতে বলতে মামা এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, প্রায় দু'রাত্তিরের খাবার খেয়ে ফেলেছিল খেয়াল না করেই। গণ্ডার, হরিণ আর ময়ূরের কাহিনী শেষ হতেই মামার খেয়াল হলো ব্যাপারটা। অমনি আঁতকে উঠে খাওয়া ব্যাপারটার ওপরে তৎক্ষণাৎ দাঁড়ি টেনে দেওয়ার মত করে মুখে বিঘত সাইজের চুরুট গুঁজে দিল, মুখ ধোয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গেল। তারপর কিছুক্ষণ চুরুট চাপা মুখে গুম হয়ে বসে থেকে হুস্ করে একটা চাপা গর্জন সহযোগে চুরুট ধরালো।

কয়েকমুখ ধোঁয়া টেনে আর উগরে মামার মুখের ভাবখানা আবার বেশ প্রসন্ন হয়ে এল। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মামা হঠাৎ মামীকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আমাদের রবীনকে তোমার মনে আছে নিশ্চয় ?'

কয়েক সেকেণ্ড চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে মামী বললো, 'ওমা, আমাদের পোষা সেই উদ্‌বেড়ালটার কথা বলছো তো ? ওকে ভুলে যাবো এরই মধ্যে !'

মামীর কথাটা শুনে মামা কেমন আবছা চোখে তাকিয়ে থাকলো। বুঝলাম, মামা এখন আমাদের কাউকে দেখছে না, দেখতে পাচ্ছে না, পুরোনো দিনগুলো এখন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। জ্বলন্ত চুরুট থেকে নীলচে ধোঁয়া উঠে মামার মুখখানাকে ঝাপসা করে দিয়েছে। স্থির ঘুম-ঘুম চোখে মামাকে ঠিক ধ্যানী বুদ্ধের মত লাগছিল।

এই সুযোগে কখন মিঠুর ঠোঁট দু'খানা আমার কানের গোড়ায় এগিয়ে এসেছিল টের পাইনি। কথা বলতে চমকে উঠলাম।

মশার মত পিন-ফোটানো মিহি গলায় মিঠু বললো, 'জলজ্যান্ত ভোঁদড় একটা !'

মেজাজ খিঁচরে গেল কথাটা শুনে। আমিও খেঁকিয়ে জবাব দিলাম, 'আমি ভোঁদড়, অ্যা !'

মিঠু মহা কিচেল। আগের মতই নিচু গলায় পাল্টা জবাব দিল, 'চেঁচাচ্ছো কেন পুপেদা, চেঁচালেই কিছু ভোঁদড় হওয়া যায় না। তাছাড়া কাঁচকলা। তোমাকে বলেছি নাকি ? বলছিলাম বাবার ফেভারিট রবীনচন্দ্দরের কথা। নামে রবীন হলেও সে ছিল একটা জলজ্যান্ত ভোঁদড়।'

মিঠুর কথাগুলো মামা-মামী কারো কানেই যায়নি। মেয়েরা সত্যি কি আস্তেই না কথা বলতে পারে ! কিন্তু আমার রকমারি সুরের হেঁড়ে গলাটি ওদের দুজনেরই কানে বিলক্ষণ প্রবেশ করেছিল, মামা তার ধ্যান ভেঙে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চোখ মেলে

তাকালো। মামী চমকানো চোখে কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, 'ওগো শুনছো, পুপে একি কথা বলে আবার! ওমা কী হবে! তুমি ডক্টর সেনকে কাল সক্কালেই একবার কল্ দাও, শুনছো—'

আমি মহা অপ্রস্তুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিই, 'না মামা, না, তোমরা যা ভাবছো, আমি তা বলিনি। বলছিলুম কি, ইয়ে, মানে, আমি ভোঁদড় খুব ভালবাসি।'

মামা খুশীভরা গলায় বলে, 'বাসতেই হবে, হেঁ হেঁ···বাসতেই হবে। বলে তুনিয়াসুদ্ধ লোক ভোঁদড়ের জন্যে পাগল, তুই-আমি আর বেশী কি। জানিস, এই প্রাণী শিকার করতে গিয়ে উত্তর আমেরিকার ইতিহাসই অন্যরকম হয়ে গেল। প্রশান্ত সাগরীয় উদের লোম পৃথিবীর সেরা। এর পশমের পোষাক ব্যবহার করা চীনদেশের রাজকীয় ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল একসময়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মধ্য-উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে কাল্পনিক মহাদেশ আবিষ্কারের দ্দেশ্যে জাহাজ পাঠিয়েছিল রাশিয়ানরা। যার ফলে আলাস্কা ও অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। আর সেই সঙ্গে সন্ধান পাওয়া যায় রিগ্যাল সমুদ্রের উদ্‌বেড়ালের আশ্চর্য সুন্দর পশমের। কিন্তু কি করে এই ঘটনা ঘটে তা কি জানিস?' মামা থামে, চুরুটে টান দিতে থাকে হাল্কা করে।

মিঠি এই সুযোগের অপেক্ষায়ই যেন বসেছিল। আমার কানে মন্ত্র দেওয়ার মত করে গুনগুনিয়ে প্রশ্ন জুড়লো, 'যাহাই উদ তাহাই ভোঁদড—কি সমাস যেন, পুপেদা?'

আমি কোনো কথা না বলে শুধু কটমটিয়ে মিঠির দিকে তাকালাম। মিঠি সাতেও নেই পাঁচেও নেই ভঙ্গিতে নিজের জামার ক্রিজ ঠিক করতে লাগলো খুব মনোযোগ দিয়ে।

'ভিটাস বেরিং নামে ডেনমার্কের যে ভদ্রলোকটি সেই রাশিয়ান জাহাজ পরিচালনা করছিলেন, জাহাজ ডুবি হয়ে তিনি একটা জনমানবশূন্য দ্বীপে আটকে রইলেন। এই দ্বীপটি শুধু যে নির্জন

তাই নয়, জাহাজ চলাচলের পথের সম্পূর্ণ বাইরেও বটে। ফলে জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। বেরিং এবং তাঁর অন্য নাবিক সাঙ্গপাঙ্গরা শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইলেন এক অভূতপূর্ব উপায়ে। হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করলেন, দ্বীপের চারপাশে অসংখ্য উদের বড় বড় ঝাঁক ঘুরে বেড়ায়। মানুষ এদের কাছে এত নতুন যে, কাছে গেলেও পালিয়ে যায় না। বেরিং-এর দলবল এই উদের মাংস খেয়ে দীর্ঘকাল বহাল তবিয়তে বেঁচে রইলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই দ্বীপান্তর থেকে তাঁরা উদ্ধার পেয়ে যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁদের সঙ্গে ছিল রাশি রাশি উদ্‌বেড়ালের পশমী ছাল। বাণিজ্যের বাজারে রীতিমত সাড়া এনে দিল এই উদের পশম। উদের ঝাঁক খুঁজতে রাশিয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রশান্ত মহাসাগরে। পরে ক্যাপ্টেন কুক উত্তর প্যাসিফিক আবিষ্কার অভিযানে বেরিয়ে উদের চামড়ার বিরাট চাহিদার খবর বয়ে নিয়ে আসেন ইংল্যাণ্ডে। ফলে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কেবল ইংরেজ নয়, তাদের দেখাদেখি ফরাসী, পর্তুগীজ এবং আমেরিকানরাও উদ শিকারের এবং উদ-বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে।' মামার চুরুট অনেকক্ষণ না টানার ফলে নিভে গিয়েছিল। তাই থেমে দেশলাই জ্বেলে আবার ধরিয়ে নিল। গলার ভেতরে নীলাভ ধোঁয়ার সেঁক নিয়ে মামা ফের শুরু করল, 'কিন্তু এসবও আজ থেকে দু'শো বছর আগেকার কথা। এখন উদ আর তেমন সহজপ্রাপ্য নয়, তাকে সবংশে সাবাড় করে এনেছে অতি লোভী শিকারী আর ব্যবসায়ীর দল। যেমন আজ গণ্ডার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে তার মূল্যবান শিং-এর জন্য।'

মামী বললো, 'এবার থামো বাপু। এই একটা ব্যাপারে তোমার ক্লান্তি নেই। এই ইতিহাস ভূগোলের লেকচার থামিয়ে ওদের ছুটি দাও, ওরা শুতে যাক। রাত অনেক হলো।'

মামা লজ্জিত হয়ে চুরুট টানতে লাগলো। এবং খাবার টেবিল থেকে ছুটি হয়ে গেল আমাদের। মামার জ্ঞানগর্ভ গল্প শুনতে

শুনতে আমার মনটা কিন্তু চলে যাচ্ছিল লেকের অপর প্রান্তে, হায়েনার খাঁচার সামনে। আমার ভেতরে কে যেন চুপিচুপি বলে দিচ্ছিল, আজ সন্ধ্যেরাতে আমি কখনো মিছিমিছি ভয় পাইনি। আমার ভয়ের কারণ কেবল উদবেড়ালের কান্না আর হায়েনার হাসি কক্ষনো নয়, নিশ্চয় অন্য কিছু ব্যাপার আছে। আমার অবচেতন মন নিশ্চয় ভারী রকমের কোনো বিপদের গন্ধ পেয়েছিল, যে বিপদ 'উৎফুল্ল'র মতই আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার তালে ছিল।

মনে মনে ঠিক করে রাখলাম, সবাই ঘুমোলে আবার অকুস্থলটা সাবধানে ঘুরে দেখে আসবো।



॥ ৫ ॥

কিন্তু শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এবং এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেল। যখন জাগলাম, দেখি সকাল পাঁচটা বেজেছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল, বলাই বাহুল্য, রাতের অভিযান ভেস্তে গিয়ে। কি আর করি, চোখেমুখে জল দিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম।

চিড়িয়াখানার ঘুম ভাঙে শেষরাতে, ভোর পাঁচটাও বলতে গেলে তাদের কাছে বেলা। বাঁদরগুলোর কোন্ সকালে বুঝি দাঁত-টাত মাজা হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন পৌছালাম, তখন রীতিমত বাঁদরামি প্র্যাকটিশ করা হচ্ছে। আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই মানুষ আসবে তাদের ডেরায়। তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে ভালোরকম রিহার্শাল দিয়ে রাখা প্রয়োজন।

আমাকে দেখতে পেয়েই গুটি তিনেক ছোকরা বাঁদর নাচতে নাচতে খাঁচার ধারে এগিয়ে এল, তারপর মনের সুখে দাঁত খিঁচিয়ে হাসতে লাগলো। বাগান এখন জনমানবশূন্য। মালীরা নিজেদের ঘর থেকে বেরোয়নি। জমাদার, খাবারদার, পাহারাদার কেউই এ-সময়ে ধারে-কাছে নেই। এদিক-সেদিক চেয়ে আমি পাল্টা ভেংচি কেটে এগিয়ে চললাম।

আলিপুরের বাগানে তখন পাখিদের বিরাট অর্কেস্ট্রা বাজছে। নানা জাতের ময়ূর-মোরগ, পাহাড়ী ময়না-তিতির, সাদা-লাল কাঁক, চামচবাজা, গয়ার, শামুকভাঙা, কোরচে বক, ধনেশ, পেলিক্যান,



রীতিমত বাঁদরামি প্র্যাকটিশ করা হচ্ছে।

আরও দৃশ্য অদৃশ্য কত পাখি নিজের বাজনা বাজিয়ে গলা সেধে চলেছে। সেই সঙ্গে পশুদের মহল থেকেও সাড়া আসচে। আর্লি টু বেড ওরা যেমন মানে, আর্লি টু রাইজও তেমনি। আমার কিন্তু প্রথমটুকুই মানা হয়, শেষটুকুতেই যত গোলমাল। মায়ের কাছে বকুনিও খাই এইজন্যে।

কিন্তু পশুপাখিরা বেশ আছে। পড়াশোনা তো আর করতে হয় না! সায়েন্স ষ্ট্রীমে পড়তে হতো যদি হায়ার সেকেণ্ডারী, তো দেখতাম বাছাদের কত তাকত! ভোরবেলা উঠেই ফিজিক্স-এর বই মুখে করে সারস বাবাজীকে যদি এক ঠ্যাং-এ দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, হাতি আর গণ্ডার ভায়াদের যদি নীরেট মাথায় দাদাদের কড়া গাঁট্টা খেয়ে রাত জেগে জেগে কেমিষ্ট্রি কষতে হতো, তাহলে দেখতাম ভোরে উঠে কত ফূর্তি করা হয়! সব আমার জানাই আছে, শুধু খেলে বেড়াতে অমন সবাই পারে!

গত রাতের রাস্তায় না গিয়ে ইচ্ছে করেই লেকের বাঁ পাশের রাস্তা ধরে হনহনিয়ে চলেছিলাম। গোয়েন্দাগিরিতে যিনি আমার গুরু, সেই ভুবন স্যার সব সময় বলতেন, যখনই প্রব্‌লেম্ সল্‌ভ করতে গিয়ে আটকে যাবে, তখনই উল্টো দিক থেকে এগোবে। কখনোই একদিক থেকে সমস্যাকে দেখবে না। সুতোর একটা মুখ জট পাকিয়ে হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাচ্ছ না, অন্য প্রান্ত ধরে এগোও। কি একটা কথা বলতে এসে ভুলে গেছ, কিছুতেই মনে পড়ছে না? তাহলে আবার সেইখানে ফিরে যাও, একটু আগে যেখানে ছিলে, যেখান থেকে কথাটা বলবার জন্যে এসেছ।

আমিও সেইজন্যেই অন্য রাস্তা ধরে গতরাতের ঘটনার দিকে এগোচ্ছিলাম। রেপটাইল হাউস-এর সামনে ভোঁদড়ের ক্ষুদে সুইমিং পুলটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটি গোটা ভোঁদড় পরিবার জলের কিনারে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। দুটি ধেড়ে আর গুটি তিনেক বাচ্চা। এই বাচ্চাগুলোই নাকি মানবশিশুর মত গলা ফাটিয়ে কাঁদে। কাল রাতে তাহলে

এনারাই আমার পিলে চমকে দিয়েছিল। যাক্ এবার হাসির মালিকের কাছে যেতে হয়।

রাজভবনের সামনে দিয়ে সেখানে এগোতে হয়। পশুরাজের যখন বাড়ি, তখন তাকে রাজভবনই বলতে হয়। সিংহ মশাই তখন তাঁর প্রাসাদের লবিতে বসে ব্রেকফাস্টের অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে বেশ ব্যাজার মুখে একটু যেন কুঁচকে তাকালেন।

পাশের ফ্ল্যাটে এক চিতাবাঘ তখন একখণ্ড দাঁড় করিয়ে রাখা গাছের গুঁড়ির ওপরে উঠে প্রাতঃকালীন যোগব্যায়াম সারছিল। মাঝের ফ্ল্যাটের বাইরে নেমপ্লেটে দেখি হায়েনার নাম লেখা। নেমপ্লেটে ইন-আউট অবশ্য কিছুই লেখা নেই। উঁকি মারলাম। নাঃ, গৃহের মালিকের সাক্ষাৎ নেই। তিনি সম্ভবতঃ অন্দরমহলে বিশ্রাম নিচ্ছেন, কারণ, সারারাত হাসতে হাসতে পেটে বুঝি খিল ধরেছে। এই বে-টাইমে আমার সঙ্গে দেখা করার মত মেজাজ শরীফ নেই তাঁর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ এইসব মজাদার কথা ভাবছি, এমন সময় নজরে পড়ল খাঁচার ওপাশে জলার ধারে একটা লোক আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সাঁ করে কোথায় সরে গেল। লোকটা ওখানে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে কিছু কুড়োচ্ছিল, তাই মুখখানা ভাল করে দেখতে পাইনি।

ব্যাপারটায় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। খাঁচা ঘুরে তাড়াতাড়ি জলার ধারে যখন এলাম, লোকটা তখন হাওয়া!

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি একটা প্রমাণ-সাইজের লোক কি করে উপে যাবে? চারপাশে তাকালাম। গোটা দুই ঝুপসী গাছ তাদের ঘেঁষাঘেঁষি ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাছেরই কোনো ডাল থেকে কি কাল উৎফুল্ল আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল?

কালকের ঘটনা আর আজকের রহস্যময় লোকটার কথা

ভাবতে ভাবতে উটপাখির খাঁচার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ পায়ে কি ঠেকতেই মাটির দিকে চোখ গেল। দেখি, খুব কারুকার্য করা পাথরের একটা ছোট্ট কলকে পড়ে আছে। একেবারে ব্র্যাণ্ড নিউ। নিচু হয়ে কলকেটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘাসের মধ্যে আরও দুটো জিনিস দেখতে পেয়ে গেলাম।

নিশ্চয়ই কোনো দর্শক ফেলে গিয়েছে। আলিপুর পশুশালায় প্রায় প্রতিদিনই সকালে বিকালে এমন কত কি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। লোকজন চলে যাবার পর, ফটক বন্ধ হয়ে গেলে মালী আর ঝাড়ুদারেরা যখন বাগান পরিষ্কার করে বেড়ায়, তখন হরেক জিনিস খুঁজে পায়—কলম, কানের দুল, ঘড়ি, ম্যানিব্যাগ, জলের বোতল, রোদ-চশমা ইত্যাদি কী-না পাওয়া যায়! মানুষ কেন এমন অন্যমনস্ক, কেন এত অসাবধানী কে জানে! এই কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো মেন-অফিসের লস্ট প্রপার্টি ডিপার্টমেন্টে জমা থাকে। মালিক খোঁজ করতে এলে, উপযুক্ত প্রমাণ পেলে দিয়ে দেওয়া হয়। আমিও জিনিসগুলো অফিসে জমা দেবার জন্যেই শেষ পর্যন্ত কুড়িয়ে নিলাম।

জিনিসগুলো পকেটে পুরে সবে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁচেছি, এমন সময় দেখি মিঠু ছুটতে ছুটতে আসছে। কী ব্যাপার? না, কালকের ওই ঘটনার পরই আজ ভোরে আমাকে নিরুদ্দেশ দেখে মামী কান্নাকাটি শুরু করেছে। বনমালী, জলধর, শিউপ্রসাদ সবাই নাকি মামীর হুকুমে আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি তো অপ্রস্তুত, সামান্য এই ঘণ্টা দেড়েক সময়ের মধ্যেই এত কাণ্ড হয়ে গেছে, আশ্চর্য!

আমাকে সশরীরে ফিরে পেয়ে মামী তো হাতে চাঁদ পেল। মামীর সত্যিই মাথায় ছিট আছে। সকালবেলা আমাকে বিছানায় না দেখে তার ধারণা হয়েছিল, রাতেই আমি উধাও হয়েছি। প্রমাণ কি? না, বাসী কাপড় পর্যন্ত ছাড়িনি। সকালে বেরোলে

নিশ্চয় জামাকাপড় বদলে যেতাম। তাছাড়া জামাগুলো যেমনকে তেমন হ্যাঙ্গারে ঝুলছে, আমি শুধু গেঞ্জি পরে কোথায় গেলাম! নিশ্চয় আমাকে নিশিতে পেয়েছে।

খাবার টেবিলে বসে মামীর সঙ্গে খুব গপ্প জমিয়েছিলাম। নিশির ডাক, তান্ত্রিকের নরবলী, আরও কত কি। ভূত-প্রেতের কাণ্ডকারখানাও বাকি ছিল না। এইসব অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে তুমুল হচ্ছিল, এমন সময় আমেরিকান টুরিস্টের মূর্তিতে মামার প্রবেশ।

মামীর হাত থেকে সদ্য তৈরি কফির পেয়ালাটা নিতে নিতে মামা বললো, 'কাল রাতে একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে রে, পুপে, এইমাত্র দেখে এলাম।'

মামীর হাত থেকে আর একটু হলে কফির পট্ মাটিতে পড়ে যেত। মিঠু, মামী, আমি সমস্বরে জানতে চাইলাম—কি হয়েছে।

মামা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। ধীরেসুস্থে চুরুটের একটা প্রান্ত দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে তাকে রেডি করতে করতে বললো, 'ডাকাতি।'

'কোথায় ডাকাতি হলো?' মামী আঁতকে উঠে জিগ্যেস করে।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে মামা বললো, 'চিড়িয়াখানায়। শেষ পর্যন্ত চিড়িখানায়ও ডাকাতি হয়ে গেল!'

আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারো মুখেই আর কথা নেই। মামার মুখে ধীরে ধীরে ডাকাতির গল্প শুনলাম।

ডাকাতরা লরী নিয়ে নাকি একেবারে মেন গেটের ভেতরে চলে এসেছিল। সংখ্যায় তারা পনের-ষোলজন হবে। কুলি-কামিন সেজে লরীতে চেপে তারা এসেছিল। দরোয়ান সন্দেহ করেনি, ফটক খুলে দিয়েছিল। ছুটির দিনে সকালে কিংবা রাত্তিরে এরকম গাড়ি হরদমই ভেতরে এসে দাঁড়ায়। তাতে করে গাছপালা আসে, আসে পশুপাখি। আসে পশুপাখিদের হরেক

রকম পাহাড়-প্রমাণ খাবার। হাতী, জলহাতী, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, অন্য প্রাণীদেরও খোরাক কিছু কম নয়। চুয়ান্নটা বাড়ি জুড়ে অজস্র খাঁচায় খাঁচায় কম বাসিন্দে তো নেই। তাদের জন্যে চাই হরেক রকম খাদ্য।

দরোয়ান গেট খুলে দিয়েছিল। তার পরের ব্যাপারটা খুবই সহজ। আচমকা পিছন থেকে মাথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে ফেলে। অন্য প্রহরীরা তখন অফিসঘরের বারান্দায় ছিল। আচমকা তাদের বন্দুক দেখিয়ে চুপ করানো হয়। তারপর হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় সেখানেই ফেলে রেখে ক্যাশ ঘর খোলে। ক্যাশঘরের দুটো আয়রন সেফ ভেঙে যাবতীয় কিছু লুঠে নিয়ে যায়। তিন দিনের টিকেট বিক্রির টাকা, এবং নতুন কনস্ট্রাকশনের দরুন আর কর্মচারীদের বেতন বাবদ অনেকগুলোই টাকা জমেছিল, তা প্রায় লাখখানেক হবে। সেই সঙ্গে হারানো সম্পত্তি বিভাগের গয়নাগাটি জিনিসপত্তর মিলিয়ে আরও বেশ কয়েক হাজার টাকার সম্পত্তি। পাহারাদার ও পুলিশ দু'জনের বন্দুকগুলোও হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বলতে ভুল হয়ে গেছে, গেটের দরোয়ান ছাড়াও চিড়িয়াখানার পাঁচজন পাহারাওলা এবং তার সঙ্গে দুজন বিটের কনস্টেবল—মোট এই আটজন বন্দীকে মামা নিজে হাতে মুক্ত করেছে। এতবড় ডাকাতি হয়ে গেল, অথচ চিড়িয়াখানার কাকপক্ষী কেউ টের পেল না। ভাগ্যিস, মামা ভোর বেলাতেই ওদিকে গিয়েছিল, আর মামীর হুকুমে জলধর, বনমালী, শিউপ্রসাদ মামাকে আমার অন্তর্ধানের কথা জানাতে গিয়েছিল। নইলে মামার পক্ষেও সব দিকে সামলানো শক্ত হতো।

কফি জুড়িয়ে গিয়েছিল। বড় বড় গুটি তিনেক ঢোঁকে পেয়ালা সাবাড় করে মামা আবার ছুটে বেরিয়ে গেল। তার নাকি এখন মরবার ফুরসতও নেই, বসে বসে গল্পগাছা করা তো দূরস্থান। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলোর কথা মামাকে আর বলা হলো না। এসব তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামাবার অবস্থা নেই তার।

মামার বিবরণ থেকে জানা যায়, ডাকাতি হয়েছে শেষরাত্তিরে। প্রথম রাতের প্রহরীদলের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে যখন দ্বিতীয় দল রোঁদে বেরোতে যাবে, প্রায় এমনি সময়। চিড়িয়াখানার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার আগে তারা মেন অফিসের সামনে একত্র হয়। ফটকের সামনের রাস্তায় পাহারারত পুলিশ দু'জনও তখন ভেতরে ঢুকেছিল।

শেষরাতে যখন এত কাণ্ড হচ্ছিল, তখন আমি কি করছিলাম? মামার দেওয়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে ঘুমোচ্ছিলাম।

বাংলোর একদিকে খুব কাছেই পশুশালার সীমানা শেষ। প্রাচীরের ওপিঠেই বাস-রাস্তা। হঠাৎ মোটর সাইকেলের শব্দ কানে এল, এবং তার পিছু-পিছু একটা ভ্যান আর জীপের আওয়াজ। মেন গেটে এসে দাঁড়ালো। বোধ হয় পুলিশ এসে গেল। মামা এই সময় রান্নার তদারকি করতে উঠে গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে আমি আর মিঠু ছুটলাম ঘটনাস্থলের দিকে।

গিয়ে দেখি ইলাহী কাণ্ড। মামার অফিস পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গেছে। কাউকে কাছে যেতে দিচ্ছে না বন্দুকধারী সিপাইয়ের দল। পুলিশ ফটোগ্রাফারের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগের দুজন এক্সপার্ট অফিস ঘরের মধ্যে কি সব পরীক্ষা করে দেখছেন। মামার সঙ্গে এস. পি. এবং ডি এস পি. কি সব কথাবার্তা বলছেন। এসে গেছেন খবর কাগজের রিপোর্টার জন তিনেক, তাঁদের সঙ্গে ফটোগ্রাফারও এসেছেন। বারান্দার এক কোণে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গতরাতের পাহারাদার আর পুলিশ দু'জন। সকলের সামনে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মেন গেটের দরোয়ান হুকোম সিং। আটজনেরই চোখ বসে গেছে, মুখ শুকিয়ে আমসি।

কিছু পরে সবাইকে জালে ঢাকা পুলিশভ্যানে চাপিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শুনলাম, সেখানে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। মামা তার এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'পুপে,



আমাদের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে 'কানামাছি' নামে একখানা উপন্যাস বেরিয়েছিল...।

মিঠু, তোমরা কেন এখানে এসেছ, যাও যাও, বাড়ি যাও।'

পুলিশের বড় সাহেবও বেরিয়ে এসেছিলেন মামার সঙ্গে সঙ্গে। সুঠাম সৌম্য চেহারা, রগের পাশের চুলগুলো সব সাদা। তিনি সহাস্যে আমাদের পরিচয় জিগ্যেস করলেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর ভঙ্গিটা এমন স্নিগ্ধ যে, মনে হয় তিনি কোনো জরুরী কাজে এখানে আসেননি, এসেছেন বেড়াতে, রীতিমত ঢিলেঢালা মেজাজে।

আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মামা নিচুগলায় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে কি যেন বললো। কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি সহর্ষে নিচে নেমে এলেন, 'ইটস্ এ প্লেজার টু মিট ইউ ইয়াং ডিটেক্টিভ,' হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে, 'শ্যাল কল অন ইউ সাম টাইম লেটার। প্রবাব্লি ভেরি সুন।'

আমার মুখখানা নিশ্চয় সিঁদুরে দেখাচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গিতে কোথাও বিন্দুমাত্র ঠাট্টা বা শ্লেষের আভাস ছিল না। বুঝলাম, বছর দুই আগের দার্জিলিং অভিযানের কথাই মামা ওঁর কর্ণগোচর করে দিয়েছে। রহস্যসন্ধানী সমিতি প্রাইভেট লিমিটেড—অর্থাৎ আমি, পশুপতি, পল্টন আর পলাশ—চন্দননগরের এই চারমূর্তির দার্জিলিঙের রহস্যজালে জড়িয়ে পড়া, নিজেদের বুদ্ধি, সাহস আর দৈববলে আবার তা থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং সেই জটিল রহস্যভেদের কাহিনী একসময় ফলাও করে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। হেডিংটা এখনো মনে আছে: ক্ষুদে গোয়েন্দাদের খোদকারি। অবিশ্যি গোয়েন্দারা সেদিন ক্ষুদে থাকলেও ঘটনাগুলো খুব সামান্য ছিল না, যে কোনো প্রমাণ-সাইজের মানুষের বুকের রক্ত জল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমাদের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী নিয়ে 'কানামাছি' নামে একখানা উপন্যাস বেরিয়েছিল, তোমরা পড়ে থাকতে পারো।

করমর্দনের অতিরিক্ত সম্মান হিসেবে ভদ্রলোককে একটা

নমস্কার করে চলে আসছিলাম, এমন সময় বারান্দার তলায় আমার নজর আটকে গেল। দু'খানা ছোট ছোট লাল কাপড়ের টুকরো পড়ে আছে দেখলাম। চিনতে বিলম্ব হলো না, এ ধরনের কাপড়ের টুকরোর বিশেষ ব্যবহার আমার অজানা নয়। আশেপাশে একটু নজর চালাতেই একটা গাছের গোড়ায় খানিকটা ছাই পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম। পা দিয়ে সেই টিকের ছাই নাড়া দিতেই ছাইমাখা দুটো পাথরের গুলি বেরিয়ে পড়লো। এই ধরনের মাটি বা পাথরের গুলি দিয়ে কলকের গলাটার ফুটো আটকে দেওয়া হয় ধূমপানের সময়। একে বলে ঠিকরে।

'কি সব নোংরা ঘাঁটছো, পুপেদা, ছিঃ!' মিঠু আমাকে মৃদু শাসন করে।

আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে না। চট করে নিচু হয়ে ঠিকরে দুটো কুড়িয়ে নিলাম। একটু তফাতে পড়ে থাকা লাল কাপড়ের টুকরো দুটোও ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে পকেটে পুরতে ভুললাম না। তারপর মিঠুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম, 'আমার গোয়েন্দা-গুরু ভুবন স্যার বলতেন, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই—'

মিঠু বাধা দিল, 'থাক. আর কবিতা আওড়াতে হবে না, ও আমি জানি। এখন কি অমূল্য রতন পেলে ওর মধ্যে থেকে, তাই বলো।'

'বাড়ি চ, বলবো।'

'আচ্ছা পুপেদা, এস পি সাহেব তোমাকে লিট্‌ল ডিটেকটিভ বলে এত খাতির করলেন. কি ব্যাপার গো?'

আমি ওকে সংশোধন করে দিলাম, 'লিট্‌ল্ নয়, ইয়ং'—

'ওই হলো। তারপর শিগগীরই নাকি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বললেন—এটাও কিন্তু কিছু ঠাট্টা মনে হলো না।'

'নয়ই তো।' আমি ভারিক্কী চালে বলি, 'তোমার পুপেদা একটা কেওকেটা নয়, বুঝলে! বাংলা খবরের কাগজ, কি গল্প-

উপন্যাস কিছুই তো পড়া হয় না, তাই জানো না। আছে, ব্যাপার আছে—'

ব্যাপারখানা জানার পর থেকে মিঠু আমার মন্ত্রশিষ্যা হয়ে পড়লো। অথচ কতটুকু বা সময়। মেন অফিস থেকে ঢিলে পায়ে পায়চারি করতে করতে বাংলোয় আমার ঘর পর্যন্ত আসতে যেটুকু সময় লাগে। আমিও মিঠুকে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিলাম। সখের ডিটেকটিভ মাত্রেরই একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে। আমার ক্ষেত্রে হলোই বা একটা মেয়ে। এও বলতে গেলে এক ধরনের নতুনত্বই হলো। আর বয়সে ছোট হলেও মিঠু ফেলনা নয়, বুদ্ধি-টুদ্ধি বেশ ধারালো। ইংরেজি বলতে কইতে পারে। খুব স্মার্ট। ওকে কথা দিলাম, চন্দননগরে ফিরে ওকে আমাদের পুরোনো রহস্যসন্ধানী সমিতি প্রাইভেট লিমিটেডের সভ্যা করে নেব।

কিন্তু মিঠুর মনে খুব আক্ষেপ। দার্জিলিং-এর মত না হোক, একটা ছোটখাটো ঘটনাও যদি এখানে ঘটতো, তাহলে ও গোয়েন্দাগিরিতে হাতে-কলমে নেমে পড়ার একটা চমৎকার সুযোগ পেত। আমার মত একজন গোয়েন্দার সাহচর্য পাওয়া কি কম কথা!

আমি ওকে বলি, 'যদি ঘটতো কি কথা, ঘটেই গেছে বলতে পারিস।'

'তার মানে, তুমি কি বলছো?'

'কেন, এই চিড়িয়াখানার ডাকাতির কেস-টা।'

'কিন্তু', একমুহূর্ত কি চিন্তা করে মিঠু দুঃখিত গলায় বলে, 'এটা তো আর আমাদের হাতে নেই। পুলিশ এর তদন্ত করছে। দেখলে তো, আমাদের কাছেই ঘেঁষতে দিল না। এর মধ্যে আমরা নাক গলাবো কি করে? এ সব বড়দের ব্যাপার—'

আমি শব্দ করে হাসলাম, 'ছোটদের জন্যে কি আলাদা করে খুন-রাহাজানি-ডাকাতি হবে নাকি তবে? আরে বাবা, লক্ষ্য-

ভেদ করতে জানলে দূর থেকে, বাইরে থেকেও করা যায়। ধরে রাখ এ কেস আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে।'

মিঠু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি মুঠো খুলে ঠিকরে দুটো দেখালাম। মিঠুর মুখ ইঞ্চিটাক হাঁ হয়ে গেল।

বললাম, 'দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমার ঘরে আয়, সব বলবো।'

স্নান-খাওয়া সেরে আমার ঘরে যখন গুপ্ত বৈঠকে বসলাম তখন বেলা পড়ে গেছে।

এই গ্রীষ্মের দুপুরেও কেমন শীত-শীত করছিল, চোখ জ্বালা, মাথা ভার কিন্তু আমল দিইনি। ঘরের দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে আমি টেবিলের ওপর আমার কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো সাজিয়ে রাখছিলাম। মিঠু অবাক চোখে দেখছিল।

ভোরবেলাকার সেই গাঁজার কলকে, একটা বড়সড় পিতলের গোল ডিবে। যে ধরনের কৌটোর মধ্যে হিন্দুস্থানীরা খৈনি আর চুন রাখে। খুলে দেখেছি, ওর মধ্যে গাঁজা জাতীয় কিছু জিনিস আছে, খৈনি নয়, ঠিক তামাকের গন্ধ না। তৃতীয় জিনিসটি একটি চাবির রিং। রিংয়ে ছ'টি চাবি রয়েছে। এক পাশে বেলায় কুড়িয়ে পাওয়া লাল ন্যাকড়া দুটো আর দুটো ঠিকরে।

আমি সন্দেহ করছিলাম, দু'জায়গাকার জিনিসগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। কলকেটা প্রথম নজরে ব্র্যাণ্ড নিউ মনে হলেও এখন দেখছি ভেতরে সামান্য আগুনের দাগ আছে। চিড়িয়াখানায় শুধু দর্শকদের ফেলে যাওয়া জিনিস এগুলো মোটেই নয়। এগুলোর সঙ্গে রাত্রের ডাকাতির একটা নিকট বা দূর সম্পর্ক আছে। আমার রাত্রের ভয় পাওয়ার পিছনে তাহলে হয়তো মানুষের হাত ছিল।

আমার যুক্তি মিঠু শুনলো স্থির হয়ে বসে। তারপর মাথা

নাড়লো। বললো, 'পুপেদা, তোমার যুক্তি ধোপে টিকছে না। এক নম্বর—তুমি ভয় পেয়েছো সন্ধ্যেরাতে, আর ডাকাতি হয়েছে শেষরাতে। দু' নম্বর—ডাকাতি হয়েছে মেন গেটে। ডাকাতরা বাইরে থেকে লরী নিয়ে এসেছিল এবং সেই পথেই তাদের বেরিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তুমি গাঁজার কলকে-টলকে কুড়িয়ে পেয়েছো চিড়িয়াখানার ঠিক বিপরীত দিক থেকে। তিন নম্বর—যারা ডাকাতি করতে আসে, তারা গাঁজা খেতে আসে না।'

মিঠুর উল্টো যুক্তিতে আমি চটলাম না, বরং ওর বুদ্ধির প্রশংসাই করলাম মনে মনে। বললাম, 'তোমার যুক্তির কোনো সদুত্তর আমি এক্ষুনি দিতে পারছি না। কিন্তু তোমার যুক্তি একথা কিছুতেই প্রমাণ করে না যে, এই ডাকাতির সঙ্গে গাঁজার কলকের কোনোই সম্পর্ক নেই। আমার কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো যে প্রথম রাতেই ফেলে যাওয়া তার কোনো প্রমাণ নেই। ডাকাতদলের সবাই যে মেন গেট দিয়েই বেরিয়ে গেছে, তারও কোনো প্রমাণ নেই। এই দলের মধ্যে চিড়িয়াখানার কোনো কর্মচারী যে জড়িত নেই, একথা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। বরং উল্টোটাই মনে হচ্ছে। এত খবরাখবর বাইরের লোকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব কি ? তাছাড়া ডাকাতির আগে বা পরে ডাকাতরা কখনো নেশা করে না, একথা কোনো কেতাবে লেখে না। মিসিং লিঙ্ক—মানে হারানো যোগসূত্র খুঁজে বের করাই ডিটেকটিভের কাজ।' আমি থামলাম। এই সামান্য কথা কয়টি বলেই গলা শুকিয়ে এসেছিল, শিরদাঁড়া ঝনঝন করছিল। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিলো।

আমি লাল কাপড়ের একটা টুকরো তুলে নাকের কাছে ধরলাম। গাঁজার ধোঁয়ার অস্পষ্ট গন্ধ তাতে লেগে আছে তখনো। সাধু-সন্ন্যাসীদের গাঁজা খেতে আমি অনেকবার দেখেছি খুব কাছে থেকে। তাই গন্ধটা আমার অচেনা নয়। মিঠুকে শোঁকালাম। ও নাক কুঁচকে বলল, 'ম্যাঃ গো, কেমন চিমসে গন্ধ।'

আমি ওয়াকিবহালের মত বললাম, 'ওই গ্যাজার গন্ধ।'



'কিন্তু তুমি গাঁজার কলকে-টলকে কুড়িয়ে পেয়েছো চিঁড়িয়াখানার ঠিক বিপরীত দিক থেকে।...যারা ডাকাতি করতে আসে, তারা গাঁজা খেতে আসে না।'

'কিন্তু তোমার পিতলের গোল কৌটোর মধ্যে যে খৈনির মত জিনিস আছে, তার গন্ধের সঙ্গে ঠিক মিলছে না।'

'কাঁচা অবস্থায় মিলছে না, আগুনে পোড়ালে ঠিকই মালুম হবে।' একটু থেমে আপসোস করলাম, 'ইস্, একটা ভুল করে ফেললাম, মারাত্মক ভুল। আসলে আগে তো ওদের জিনিস বলে সন্দেহ করিনি, তাই—'

ফ্যাকাশে মুখে মিঠু বলল, 'কি ভুল?'

'কৌটোর গায়ে নিশ্চয় ওদের আঙুলের ছাপ ছিল। ঘাঁটাঘাঁটি করে সে ছাপের বারোটা বাজিয়েছি আমরা। যাকগে', আমি মাথা চুলকে বলি, 'আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, এখন থেকে যা যা ঘটবে, কাউকে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করবি না। এবং আমার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবি?'

'কি ঘটবে?' ঈষৎ কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, 'আগে বলো।'

'যা কিছু, সব কিছু।' আমি শক্ত গলায় বললাম, 'যেমন, যা যা ইতিমধ্যে ঘটেছে বা এক্ষুনি ঘটবে। যেমন, এক্ষুনি আমাকে ওই মশলা কলকেয় সেজে টেনে দেখতে হবে।'

'মাই গড! তুমি গ্যাঁজা খাবে!'

'তাতে কি, ডিটেকটিভদের কিস্সু বারণ নেই, দোষ হয় না। তা ছাড়া', মাথা চুলকে বলি, 'আমি তো খাচ্ছি না, পরীক্ষা করছি মাত্র।'

মিঠু হাসলো, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! গন্ধটা মেলাবার জন্যে তো গ্যাঁজা টানতে চাইছো? এক কাজ করো, একটা কাগজের মোড়কে মশলাটা রেখে আগুন দিয়ে পোড়াও, তাহলেই গন্ধ পাবে।'

মিঠুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'সাবাস মিঠু! তোর এত পরিষ্কার বুদ্ধি? তুই আমার যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

'আর আমিও তোমার গায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি,' মিঠু আমার গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলো, 'ইস্, একি! এ যে

গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে— !'

আমি ম্লান হাসলাম, 'জ্বর এসে গেছে তা হলে? আমি এরকমই আশঙ্কা করছিলাম।'

'ভীষণ জ্বর, হাই টেম্পারেচার! আমি এক্ষুনি'—

উঠে দাঁড়িয়েছিল মিঠু, আমি ওর হাত ধরে টেনে বসালাম, 'প্রতিজ্ঞা ভুলে যাচ্ছিস, এখন থেকে যা যা ঘটবে···এই জ্বরের খবরও এখন চেপে থাকতে হবে, নইলে সব কেঁচে যাবে। আমি বিছানায় আটকে গেলে সব গুবলেট হয়ে যাবে। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা চলবে না এখন। দে, খানিকটা কাগজ দে, একটা দেশলাই যোগাড় করে আন। মামী যেন টের না পায়।'

ব্যথিত মুখে মিঠু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জ্বর এসেছে জানার পর থেকে আমিও খুব দুর্বল বোধ করছিলাম। কাগজ আর দেশলাই আনলে মিঠুকে চুপিচুপি থার্মোমিটার আনতে পাঠালাম। মিঠু বেরিয়ে গেল। আমি কৌটো থেকে বেশ বড় এক খামচা তামাক নিয়ে কাগজে ডালা পাকিয়ে আগুন দিলাম। বেশ তেজী ধোঁয়া বেরোতে লাগলো, আমার নাক চোখ কেমন জ্বলে উঠলো, মাথা ঝিমঝিম করছে, চোখ ভারি হয়ে বুজে আসছে। আর বসে থাকতে পারছিনে। একটা দম বন্ধ-করা ঘুম যেন আমার সমস্ত শরীরে চেপে আসছে। আমি কিছুতেই যেন মাথা ঠিক রাখতে পারছি না, ভাবতে পারছি না, বাইরের আলো মরে এসেছে, আকাশ বুঝি মেঘলা, ঘরের জানলাগুলো অন্ধকার···ভয় করছে··· ভীষণ ভয়···মিঠুকে চেঁচিয়ে ডাকলাম, কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ, স্বর বেরোলো না—তারপর আর কিছু মনে নেই।

৬ ॥

এই বাংলো বাড়িটা কেমন যেন!

বড় বড় ঘরগুলো কেমন চুপচাপ। ছায়া-ধরা, ছমছমে। চোখ বুজলেই দেওয়ালগুলো ফিসফিসিয়ে কথা বলে। চোখের পাতার মত দরজা-জানলার পাল্লা-কপাট—এই খুলছে, এই বুজছে। আপনা থেকেই। কিন্তু শব্দ নেই। ছিটকিনিগুলো জ্যান্ত আঙুলের মত, নড়েচড়ে, মটমট শব্দ করে। যেন আঙুল মটকায়। কাচের শার্সিতে দিনরাত অদ্ভুতুড়ে সব ছায়াছবি ভেসে উঠেই পরক্ষণে আবার মিলিয়ে যায়। কিম্ভূতকিমাকার গল্পসল্পর মত। যেন জাদুমন্তর করা টেলিভিশন সেট্—কখন যে কি ছবি, কি তার মানে, কেউ জানে না।

জ্বরের ঘোরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে আমি কেবলই ভাবি এই বাড়িটার কথা। এর সকালের সঙ্গে দুপুরের, বিকেলের সঙ্গে রাত্তিরের কত তফাত। গিরগিটি যেমন এক জায়গায় শুয়ে শুয়েই রঙ বদলায়, লাল নাল হয়, হলদে কালো হয়, এই বাড়িটাও তেমনি। প্রহরে প্রহরে চোখ বুজলে কিংবা তাকালে চেহারা বদলায়। থেকে থেকে বুনো গন্ধে ঘর ভরে যায়, বনের শব্দে চমক লাগে। বাঘ-সিংহের গর্জন, হাতির ডাক, শম্বরের ডাক কানে আসে। আরও কত নাম-না-জানা পশুপাখি বিচিত্র আওয়াজ তোলে। কখনো একেবারে কানের কাছে। গভীর ভয়ঙ্কর নিঃশ্বাসের মত; কখনো যেন মাইল-দূরে গুড়গুড়ে মাটি কাঁপানো

আওয়াজ।

বিছানায় শুয়ে তখন মনে হয় উগাণ্ডা কি কেনিয়ার জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে আছি। বাইরে জংলীরাত খুব কাছে কোথাও থাবা পেতে বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়। কিংবা মটমট করে মোটা মোটা গাছের ডাল ভাঙছে কোনো দলবদ্ধ অন্ধকার— যে কোনো সময় হুড়মুড়িয়ে তাঁবুর ওপর এসে পড়ে সবসুদ্ধু মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিতে পারে।

কখনো মনে হয়, বোটে করে ভেসে চলেছি দক্ষিণ আমেরিকার বিপদসঙ্কুল গহন নদীপথ দিয়ে। সাপ, কুমীর, জলহস্তী সবাই তক্কে তক্কে আছে। কাফ্রী নিগ্রো কুলীরা দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইছে নিচু সুরে। আমার কোলের কাছে টোটাভরা বন্দুক সজাগ। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। ডেকের ওপর আগুন জ্বেলে বিকেলের শিকার করা মাংস ঝলসে নেওয়া হচ্ছে। নদীর স্রোতের টান অন্ধকারে কেবলই তীব্র হচ্ছে। বোট দুলছে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

বাড়িটা এমনিভাবে স্থানকাল ভুলিয়ে দেয়। নিজের কথাও সব সময় মনে থাকে না। ভুলে যাই আমি অসুস্থ, শুয়ে আছি। দেওয়ালে দেওয়ালে জীবজন্তুর এনলার্জ করা ফটো, এখানে-সেখানে মাউণ্ট করা পশুপাখির ফুল ফিগার স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে। বিরাট ডালপালার মত শিংসুদ্ধু হরিণ কিংবা গণ্ডারের আকণ্ঠ মুণ্ডু টাঙানো। এই বাড়িটা মর্গের মত মরা কুঠি। কিন্তু যাদের শরীর নেই, তারাও বুঝি ঘুরে বেড়ায় এখানে। তাদের পায়ের খসখসানি চোখ বুজলেই শুনতে পাই।

মামা কোন্ সকালে নিচে নেমে যায়। নিচ তলাতেই তার কর্মস্থল। সেখান থেকে বাগানে, তারপরে অফিসে। মামী তার রান্নাবান্না আর পঁচিশ রকমের তদারকিতে ব্যস্ত। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে ঘরে আসে। খোঁজখবর নেয়। ওষুধ-পথ্য খাইয়ে চলে যায়। শুধু ঠায় বসে থাকে মিঠু। আমার শিয়রে

চেয়ার টেনে। কখনো হয়তো বই পড়ে, কখনো ছবি আঁকে, কখনো গল্প করে আমার সঙ্গে। কিন্তু তার এই রুটিনেও ইদানীং টান পড়েছে, পরীক্ষা শুরু হয়ে যেতে। এখন অনেকটা সময়ই সে অনুপস্থিত। আমার এই একলা সময়টা অনেকখানিই ভরে দিয়েছেন আর একজন মানুষ। নতুন মানুষ বলাই ভালে, কারণ এতদিন তাঁকে দেখিনি এ-বাড়িতে।

তিনি শিবুদাদু। সকলেরই শিবুদাদু। আমার, মিঠুর, জলধরের, এমনকি অশ্বিনীমামার পর্যন্ত। বয়স আশীর কোঠায়। কিন্তু কে বলবে! শক্ত, সতেজ চেহারা; পাকা বাঁশের মত। চুল দাড়ি গোঁফ সাদা, ভুরু সাদা, গায়ের হাতের লোম পর্যন্ত সাদা, অথচ দাঁত পড়েনি একটাও, বোধহয় নড়েওনি। চশমা নেই, শুধু চোখেই চোখ পরীক্ষার চার্টের শেষ লাইনটি পর্যন্ত পড়ে দিতে পারেন বিশ ফুট তফাতে দাঁড়িয়ে। তাজ্জব মানুষ। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা দেহখানা অবশ্য এখন একটু কুঁজো হয়েছে। প্রায় এক ফুট লম্বা নলের একটা অদ্ভুত আকৃতির পাইপ টানেন। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের আড়ালে মুখের হাসিটি দেখা যায় না, কিন্তু চোখ দুটো যেন হাসছেই। হাসির সঙ্গে সঙ্গে সাদা ভুরু জোড়া খঞ্জনী পাখির ল্যাজের মত নেচে ওঠে।

ইদানীং রোজই সন্ধ্যেবেলা তিনি আসেন, কারণ এই সময়টাই আমাকে বহুক্ষণ একলা থাকতে হয়। ধারেকাছে কেউ থাকে না। শিবুদাদু এসে আমাকে বাঁচিয়ে দেন। সারা জীবন শিবুদাদু কেবল কাজ করেছেন, কথা বলেননি। এখন উল্টোটা। বাকি জীবন এখন শুধু কথাই বলেন, কাজ করেন না। মোটা পেন্সন আর জমা টাকার সুদে দিব্য চলে যায়। আমার মত আদর্শ শ্রোতা পেয়ে শিবুদাদুর উৎসাহ যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেছে। গল্পে গল্পে ছয়লাপ করে দেন। আমি আড়ালে শিবুদাদুর নাম দিয়েছি গল্পদাদু। কিন্তু লোকটি বৃদ্ধ হলে কি হবে, এখনো শিশুর মতই চঞ্চল। এই শিয়রের কাছে বসে গল্প বলছেন, চোখ বুজে আমি শুনছি, হুঁ-হাঁ

দিয়ে যাচ্ছি দুর্বল শরীরে সাধ্যমত। গল্প থামতেই চোখ মেলেছি, দেখি নেই, কখন উঠে গেছেন। অভিমানে আবার চোখ বন্ধ করে হয়তো শুয়ে আছি, কপালে কেউ হাত রাখলো। চেয়ে দেখি, গল্পদাদু ফিরে এসেছেন আবার।

'কোথায় গিয়েছিলেন, দাদু, কোথায় ছিলেন ?'

'আরে ভাই, তোমার মামীর সঙ্গে আবার একটু রান্না-খাওয়ার গল্প করে এলুম। ও-ও আমার নাতনী হয় কিনা, আমি তো সকলেরই দাদু !'

'দাদু দ্য ইউনিভার্সাল ?' আমি ঠাট্টা করে বলি।

আজকেও শিবুদাদু উঠে যাবার পর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিঠু এসে ঘরে ঢুকলো, মুখ রীতিমত ফ্যাকাশে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই হাসলাম, 'কোনো নিউজ আছে ?'

মিঠু আমার হাতে একখানা চিরকুট গুঁজে দিয়ে বললো, 'সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেল, পুপেদা। এই চিঠিটা এইমাত্র পেলাম, পড়ে দেখ।'

নিচে পড়ার ঘরে বসে বসে পড়ছিল মিঠু। সন্ধ্যেবেলা, কেউ ছিল না। হঠাৎ সামনের জানলার কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে ঘরের মেঝেয় কি ছিটকে পড়লো। কুড়িয়ে নিয়ে দ্যাখে এই চিঠিটা একখণ্ড পাথরের সঙ্গে জড়ানো।

চিঠিটা পড়ে উত্তেজনায় আমি উঠে বসতে গিয়েছিলাম। মাথাটা বোঁ করে ঘুরে যেতেই আবার ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ রেখেই মিঠুকে নির্দেশ দিলাম, 'মিঠু, আমার টেবলের ড্রয়ার থেকে সেই জিনিসগুলো বের করতো—'

মিঠুও সঙ্গে সঙ্গেই ড্রয়ার খুলে চেঁচিয়ে উঠলো, 'পুপেদা, সব গেছে !'

ড্রয়ারটা সত্যিই ফাঁকা। দেরাজটা টেবল থেকে বের করে নিয়ে এসে মিঠু দেখালো। গাঁজার কলকে, চাবির রিং আর সেই

গাঁজা জাতীয় জিনিসের কৌটোটা হাওয়া হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে লাল শালুর টুকরো আর পাথরের ঠিকরে দুটো।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই তুচ্ছ জিনিসগুলোর জন্যে ডাকাতরা আবার চিড়িয়াখানায় ফিরে এসে আমার ঘরে হানা দিল? প্রথম আশ্চর্য, কি করে জানলো যে, জিনিসগুলো আমিই পেয়েছি। দ্বিতীয় আশ্চর্য, এত লোকজনের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে আমার ঘরে ঢুকলো এবং জিনিসগুলো সরালো? আমার ঘরে সব সময়েই প্রায় কেউ না কেউ আছে। টেবিলটাও আমার চোখের সামনেই রয়েছে। তৃতীয় আশ্চর্য —

'পুপেদা, তা হলে?' আমার চিন্তায় ছেদ ফেলে মিঠু হতাশ গলায় প্রশ্ন করলো। গোয়েন্দা-সহকারীরা মাঝে মাঝে যেমন নিরাশার অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে পড়ে, মিঠুর চোখমুখেও তখন তেমনি ছায়া পড়েছে। আমি প্রবীণ গোয়েন্দাদের মত মৃদু মৃদু হাস্য করলাম। গল্পের বইয়ে গোয়েন্দাদের এরকম সময়ে এই স্টাইলেই হাসতে দেখেছি।

মিঠু চটেমটে লাল, 'আমি চোখে অন্ধকার দেখছি আর তুমি মিচকে-পটাশের মত হাসছো?'

'ছিঃ, মিঠু, তুমি না আমার জুনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট? গুরুজন গোয়েন্দাদের কখনো ও ভাষায় সম্বোধন করতে নেই।'

মিঠু সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে বললো, 'আমার অন্যায় হয়েছে, পুপেদা। তাছাড়া মিচকে-পটাশ নামে সত্যিই কিছু আছে কিনা, আমি জানি না। কিন্তু জিনিসগুলো যদি হাতছাড়াই হয়ে গেল তাহলে আমরা রহস্যভেদ করবো কি দিয়ে?'

হাতের চিঠিটা দু'বার হাওয়ায় নাচিয়ে বললাম, 'হাতে রইলো এই পেন্সিল, থুড়ি এই চিঠি। হানাদারেরা তাদের সব চিহ্ন মুছে দিয়ে যেতে পারেনি। কিছু সূত্র রেখে গেছে—'

'সূত্র! ওকে তুমি সূত্র বলছো কি, পুপেদা? ও তো শুধু কয়েক ছত্র গালাগাল আর শাসানি। ওর মধ্যে তো আর কিছু

নেই। নাম পর্যন্ত না। ওই শুকনো চিঠি শুঁকে তো আর হানাদারদের ধরা যাবে না!'

আমি জানলা দিয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'ধরতে জানলে ও থেকেই ধরা যায়। যা যায় তাও কিছু দিয়ে যায়। এই ছাখ না, কয়েকটা জিনিস জলের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক নম্বর, জিনিসগুলো চিড়িয়াখানার সাধারণ দর্শনার্থী কারো নয়। দু'নম্বর, রাতের ডাকাতির সঙ্গে ভোরের কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। তিন নম্বর, ডাকাতদল কেবল চিড়িয়াখানার বাইরের লোক নিয়ে তৈরি নয়। চিড়িয়াখানার লোকজনও নিশ্চয় এর মধ্যে আছে। আর আমরা নিশ্চয় ঠিক পথেই চলেছিলাম, চার নম্বর সিদ্ধান্ত। নইলে পুলিশকে ছেড়ে আমাদের ওপরে ওনাদের কৃপাদৃষ্টি হলো কেন?'

'তোমার কথাগুলো শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, পুপেদা। তুমি এত শিখলে কোত্থেকে? তুমি জাস্ট্ নাউ একজন রিয়্যাল গোয়েন্দার মত ডায়ালগ ছাড়ছো কিন্তু! দোহাই তোমাকে, একটু খুলে বুঝিয়ে বলো, প্লিজ—'

মিঠুর কথার কোনো জবাব না দিয়ে শুধু হাতের চিঠিটা একবার উচ্চারণ করে পড়ে দিলাম—'ওরে ক্ষুদে টিকটিকি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর ল্যাজ নাড়িস না। তোর খুকী সাকরেদকে সামলা। নইলে তোর ল্যাজ মাটিতে খসে পড়ে ছটফটাবে। ভাঁড়ার ঠিক আছে তো, বাছা?'—

'কেন পড়ছো? গা জ্বলে যায়!' মিঠু ভ্রুকুটি করে। নাক ফোলায়।

আমি বললাম, 'প্রমাণ, আমার কথাগুলোর হাতে-কলমে প্রমাণ এটা। ছাখ মিঠু, আমার মনে হয়, চিড়িয়াখানার চাকর-দারোয়ান-চাপরাশী কাউকেই বিশ্বাস নেই। সব দিকেই চোখ-কান খোলা রাখবি, মুখ বাদে। ইস্, তক্ষুনি যদি একবার বাইরে উঁকি মারতিস···এই গরমের মধ্যেও কেন যে জানলা বন্ধ করে পড়তে

বসেছিলি, আশ্চর্য !'

'হুঁঃ,' মিঠু ঠোঁট উল্টে জানায়, 'সাধে কি আর বাগানের দিকের দরজা-জানলা বন্ধ করে বসেছিলাম, পুপেদা ? বনমালী আর শিউপ্রসাদ দু'জনে মিলে বাগানে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন দিয়েছিল। তার ধোঁয়ার ঠেলায়! আর দরজা খুলে বাইরে আমি উঁকিও মেরেছিলাম—কিন্তু আমাদের কম্পাউণ্ডের মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখিনি।'

আমি একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলাম, 'বনমালী অর্থাৎ সেই বুড়ো মালীটা ? আর শিউপ্রসাদ চাপরাশী ? ওরা কোথায় ছিল, কি করছিল তখন ?'

'ওরা কদমগাছের নিচে বসে ভজুডির সঙ্গে গল্প করছিল। কেউ ছুটে পালালে নিশ্চয় দেখতে পেত।'

আমি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করি, 'ভজুডি ? সেটা আবার কে ?'

'মাই গুডনেস্! চেন না ভজুডিকে ? আমার ধারণা ছিল, তোমাদের রীতিমত পরিচয় আছে !'

'ছাই আছে ! আমি মনেই করতে পারছি না, লোকটা কে ? কিন্তু ভজুডির কথা পরে আসছে, কিন্তু তার আগে বলে রাখি, তোমাদের এই বুড়োমালী সম্ভবতঃ লোক সুবিধের নয়। সুযোগ পেলেই আমাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে। কেন ?'

মিঠু একটু থমকে গিয়ে বললো, 'তা জানি না। তবে প্রথম দিনই তোমার সম্বন্ধে আমার কাছে খোঁজখবর নিয়েছিল, মনে পড়ছে।'

'তবে ?' আমি ভুরু নাচিয়ে বলি, 'ওর কেন এত কৌতূহল, বল ?'

আগের প্রসঙ্গের খেই ধরে মিঠু বলে, 'এই জু গার্ডেনের মালীদের সর্দার ভজুডি। তুমি তাকে নিশ্চয় দেখেছ। মাথায় বিরাট করে পাগড়ি বাঁধে এক এক সময়। আমার ধারণা ছিল, তোমার সঙ্গে আলাপ আছে।'

সাদা পাগড়ি কোথায় যেন দেখেছি, কার মাথায়। কিন্তু

ভেবে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না! বললাম, 'আলাপ আছে, একথা কেন ধারণা হলো তোর?'

'বাঃ, রে, সেদিন ভোরবেলা দেখলাম যে, তুমি আর ভজুডি গল্প করতে করতে আসছো।'

'আমি?' আমি আকাশ থেকে পড়ি, 'বলিস কি! কবে?'

'যেদিন সকালে তোমাকে পাওয়া যাচ্ছিল না।'

ব্যস্, অমনি বিদ্যুচ্চমকের মত সব ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার। কেমন সন্দেহ হলো, সেদিন হায়েনার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে যাকে সাঁ করে সরে যেতে দেখেছিলাম, সে-ই ভজুডি নয় তো? মিঠুর কথায় মনে পড়লো, লেকের পাড় থেকে ফেরবার সময় পাগড়ি মাথায় একটি হিন্দুস্থানী লোক আমার পিছু পিছু আসছিল। প্রথমটায় খেয়াল করিনি। পরে হাঁচির শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই লোকটা দাঁত বের করে বললো, 'রাম রাম খোঁকাবাবু, এই সকাল বেলা কোতা যাইতেছেন?'

কাঠবেড়ালীর লেজের মত একজোড়া ফুলকো গোঁফ। মাথায় আস্ত একখানা ধুতিই বোধ করি জড়িয়েছে লোকটা। ইয়া বিরাট মাথা, যেন একমাথাওয়ালা রাবণ। খোকাবাবু সম্বোধনে বিরক্ত হয়েছিলাম। চিনি না শুনি না, এভাবে কথা বলে কে এ লোকটা! কটমট করে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম, 'বেড়াচ্ছি।' তারপর হনহন করে এগিয়ে গেলাম।

মিঠু আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। ভেতরে ভেতরে বুঝি অধৈর্য হয়ে উঠেছিল জবাব না পেয়ে।

'ওঃ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, তোর ভজুডিকে আমি নিশ্চয় দেখেছি, কথাও বলেছি, তবে গল্প নয়। কিন্তু তোর স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করতেই হয়। এত সামান্য ঘটনাও তোর মনে আছে, আশ্চর্য—'

মিঠু মুচকি হেসে বললো, 'প্রশংসা করছো করো, শুনতে আমার ভালই লাগে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে

হয়, এই ঘটনাটা মনে থাকার অন্য কারণ আছে।'

'অন্য কি কারণ?' আমি ক্রমশঃ কৌতূহল বোধ করি।

'জোঁক।'

'জোঁক!' আমি প্রতিধ্বনি করি, 'সে আবার কি?'

'সেদিন ভজুভির কনুইয়ের কাছে একটা জোঁক কামড় দিয়ে লেগে ছিল, আমিই প্রথম দেখতে পেয়ে চমকে উঠি। ভজুডি কেমন ঘাবড়ে যায় আমার চিৎকার শুনে। আমাকে চুপ করতে বলে ও তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে পালিয়ে যায়।'

কিন্তু জোঁক এল কোত্থেকে? জলা থেকে নিশ্চয়? তাহলে তো আর সন্দেহ থাকে না যে, এই লোকটাই সেই লোকটা। আমাকে দেখতে পেয়েই হয়তো জলে নেমে পড়েছিল। জলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ায়, আমি আর ওকে দেখতে পাইনি। কিন্তু ও ওখানে এমন কি করছিল, যা আমার বা কোনো লোকের চোখে পড়ায় নারাজ ছিল? প্রশ্নগুলো আমার মনের মধ্যে উত্তর-বিহীন হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

'সেদিন কখন ঘটেছিল ঘটনাটা?'

'তুমি বাংলোয় ঢুকে যাবার পরই। তোমার পিছন পিছনই তো ও আসছিল! আমি দূর থেকে দেখছিলাম। তুমি বাংলোর মধ্যে চলে যাবার পর ও এল, আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বললো, আর তখনই আমার চোখে পড়লো জোঁকটা।'

'ঠিক দেখেছিলি তো? না, চোখের ভুল?'

'আমার চোখ অত ভুল করে না, পুপেদা। তাছাড়া ভজুডি নিজেও তো জোঁকটাকে দেখলো, টেনে খসাবারও চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। তারপরেই সীয়ারাম বলে একটা আর্তনাদ করেই টেনে দৌড় লাগালো।

'জোঁকের মোক্ষম দাওয়াই হচ্ছে নুন। জোঁকের মুখে নুন—প্রবাদে বলে। নুন দিলে জোঁকের বারোটা বেজে যায়।' আমি কথাটা বলে ফের শুধোই, 'মিঠু, ভজুডি জলে নেমে এই

ভোরবেলা কি করছিল? ওর কি কাজ?'

'তাই তো, পুপেদা, জলায় ওর কি কাজ? ও তো ডাঙার মালী, জলা ওর এলাকা নয়।'

আমি ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে দেখি, তারপর উত্তেজিত গলায় বলি, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

'ইয়েস স্যার!' মিঠুও সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেয়।

'ভজুড়ি একটা সন্দেহজনক ক্যারেকটার, বুঝেছো? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। চিঠির ব্যাপারটা ওরই কীর্তি কিনা কে জানে!' আমি ঝানু গোয়েন্দার মত মুখ করে বলি।

'আহা, ও যেন বাংলা লিখতে জানে!' মিঠু অনাস্থা জানায়।

'লেখাতে জানে অন্তত? নিদেন পক্ষে চিঠি পৌঁছে দিতে?'

মিঠু আমাকে একটা সেলুট করে আবার পড়তে চলে গেল শিবুদাদুর জন্যে কিছুক্ষণ মনে মনে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তিনি ফিরে এলেন না। আমি শুয়ে শুয়ে আগাগোড়া ঘটনা ভাবতে লাগলাম। কোথাও আটকে গেলে বালিশের তলা থেকে কালো-রঙের চামড়া বাঁধানো ডায়েরীখানা বের করে মাঝে মাঝে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম।

সেদিন দুপুর বেলায় গাঁজার মোড়কে আগুন দেওয়ার পর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, আমার শরীর ভীষণ দুর্বল ছিল, জ্বরও ঠেসে এসেছিল, কিন্তু সেই কারণে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি-লাম এমন মনে হয় না, অথচ গাঁজার ধোঁয়া সামান্য পরিমাণে নাকে গেলে কেউ অজ্ঞান হয়ে যাবে এমন ভাবাও হাস্যকর। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? নিশ্চয়ই গাঁজার মধ্যে এমন কিছু ওষুধ ছিল, যাকে ঘুমের ওষুধ বা অজ্ঞান করার ওষুধ বলতে পারি। যা নাকে গেলে সবাই অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। গাঁজার মত করে টানলে তো নিশ্চয়ই। মিঠুর হিসেব মত আমি প্রায় ছ' ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। ডাক্তার এসে অবশ্য মূল কারণ

কিছুই বুঝতে পারেননি। তিনি এটাকে জ্বরের ঘোর মনে করেছিলেন। মিঠুও তখন সন্দেহ করেনি। কিন্তু বাড়িতে খবর দেবার আগে আমার কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো ড্রয়ারে লুকিয়ে ফেলেছিল বুদ্ধি করে। নইলে সব জানাজানি হয়ে যেতো বাড়িতে।

কিন্তু তাহলে প্রশ্ন আসছে, এই ধরনের মাদকদ্রব্য কৌটোয় ভরে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছিল কি জন্য? নিজে নেশা করে অচৈতন্য হবার জন্য নিশ্চয় নয়। সেরকম নেশা কেউ করতে চাইলে ঘরে করবে, বাইরে কেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন ব্র্যাণ্ড নিউ গাঁজার কলকে কোত্থেকে এল। সে রাতে একাধিক কলকেয় করে কারা নেশা জমিয়েছিল? দুটো শালুর টুকরো এবং দুটো ঠিকরে দেখে অনুমান করা শক্ত নয়, অন্ততঃ দুটো কলকে একই সময়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, যদি না আরও বেশী হয়ে থাকে। তাহলে সেই ব্যবহারের ফলাফল কি? উদ্দেশ্যই বা কি?

কোনো প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যদিও এখন আমার জ্বর নেই, তবু সত্য সত্য অসুখ থেকে ভুগে ওঠায় শরীর মন দুই-ই খুব দুর্বল। বেশীক্ষণ চিন্তা করলে মাথা ঝমঝম করে, রীতিমত অবসাদ বোধ হয়। এখনও তেমনি অবস্থা দাঁড়ানোয় ডায়েরীটা বালিশের তলায় চালান করে দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলাম। ভাবনা-চিন্তাগুলোকে জোর করে মাথা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

॥ ৭ ॥

শব্দটা আমি আগেই শুনতে পেয়েছিলাম।

শব্দটা শুনেই বলতে গেলে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু ঘুম ভেঙে গেলেও একটু নড়লাম না, যেমন শুয়ে ছিলাম তেমনি শুয়ে থাকলাম।

ঘর অন্ধকার। চোখ খুলেও কিছু নজরে পড়লো না। শুধু খসখসে আওয়াজটা থেকে থেকে কাছে আসতে লাগলো। কেউ যেন সন্তর্পণে আমার ঘরের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? আমার ঘরের দরজা শোবার আগে বন্ধ করে শুয়েছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে।

এক জানালা। কিন্তু ঘরের দুটো জানালাই গরাদে না থাকলেও দুর্গম। নিচে থেকে কিছু বেয়ে উঠবার উপায় নেই। সামনের জানালার দিকে তাকালাম। খোলা জানালা, টান-টান করে পাতলা পর্দা টেনে দেওয়া আছে। বাইরে আকাশে জোৎস্না থাকায় তার আভায় জানালাটা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তবে বিশ্বাস নেই এ বাড়িকে। এখানে সবই সম্ভব। দরজা-জানলাগুলো কখন প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে তার ঠিক নেই। জ্যান্ত হয়ে ওঠে দেওয়ালের মাউন্ট করানো মূর্তিগুলো। বাইসনের নাকে গরম নিঃশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে, খড়কুটোয় ভরা বাঘ লেজ আছড়ায়, চোখ জ্বলে। তার গায়ের গন্ধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমি দিশেহারা হয়ে যাই। অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকি

অন্ধকারের দিকে।

অবিশ্যি এই শব্দটার উৎস এ বাড়ির পোষা উল্লুক উৎফুল্ল হতে পারতো, আগে আগে রাতে এসে ও এরকম জ্বালাতো কোনো কোনো দিন। কিন্তু আজ দু'দিন যাবত উৎফুল্লকে পাওয়া যাচ্ছে না। দিনে রাতে যে বার বার খাবার খেতে আসতো, সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে! মামা খুব চিন্তিত হয়ে লোক লাগিয়েছিল, কিন্তু চিড়িয়াখানার গাছপালা ঝোপঝাড় তন্ন তন্ন করেও উৎফুল্লর কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়নি। উৎফুল্লর কি হলো এটা একটা সত্যিই রহস্য। মামী তো কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়ে বসে আছে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় গায়ে কাঁটা দিল। প্রথমটায় মনে হয়েছিল নিশির ডাক। নিশি নাকি এমনি ভাবেই ডাকে মানুষকে। আর সে ডাকে সাড়া দিলেই সর্বনাশ। মানুষ তখন মন্তরে বাঁধা পড়ে যায়। ঘুমে পাওয়া মানুষের মত সংবিৎ হারিয়ে পায়ে পায়ে এগোয়। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোয়।

'পুপেদা! পুপেদা গো'—কানের গোড়ায় মশার মত পিনপিনে গলায় কেউ আবার ডাকলো। এ নির্ঘাত মিঠুর গলা। তৃতীয় বারে শুধু ডাক নয়, মিঠুর হাত এসে পড়লো আমার গায়ে, স্বর এক পর্দা চড়লো, 'এই পুপেদা, কুম্ভকর্ণ দি গ্রেট, ওঠো শিগগীর, ওঠো—'

আমি ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসে চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কী হয়েছে? কি ব্যাপার? তুই এ ঘরে কি করে এলি?'

মিঠু ততোধিক চাপা গলায় বললো, 'দরজা খোলা ছিল। কে যেন তোমার ঘরের দরজা খুলে এই মাত্তর বেরিয়ে গেল।'

ভীষণ চমকে উঠে বললাম, 'বলিস কি?'

'হ্যাঁ।' মিঠু আমার হাত ধরে টানলো। আমি খাট থেকে নেমে প্রায় নিঃশব্দে টেবলের ড্রয়ার থেকে আমার সখের পেন্সিল-টর্চটা খুঁজে নিলাম। সরু একফালি আলোর রেখা অন্ধকারে

পথ করে চললো।

আমরা দু'জনে টর্চের আলোয় দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে অবশ্য আলোর দরকার ছিল না। মিঠু আমার হাত থেকে টর্চটা নিয়ে নিবিয়ে ফেলেছিল। তখন শেষরাতের জ্যোৎস্নায় নিচের বাগান আলোছায়ার গোলকধাঁধায় পরিণত হয়েছিল।

মিঠু নিঃশব্দে আঙুল তুলে বাগানের ভেতরের কিছু দেখালো। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পরে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে যেন কি করছে!

চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কে ওটি?'

মিঠু আমার চেয়েও নিচু গলায় বললো, 'কি জানি! তোমার ঘর থেকেই তো বেরিয়ে গেল একটু আগে।'

'তুই এখানে থাক, আমি দেখে আসি।'

'না। আমিও যাবো।' মিঠু আমার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালো।

নিচের দরজাও খোলা ছিল। আমরা সাবধানে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে। তারপর গাছের ছায়ায় ছায়ায় গা মিলিয়ে এগোলাম।

ছায়ামূর্তিটি আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গিয়েছিল কিনা জানি না। সে হঠাৎ হনহনিয়ে আমাদের বাগান থেকে বেরিয়ে পশুশালার রাস্তায় পা বাড়ালো। আমরাও প্রয়োজন মত দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু নিলাম।

এপথ ওপথ ঘুরে মূর্তিটি শেষে চিড়িয়াখানার এক নির্জন প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। জায়গাটায় কয়েকটা দুষ্প্রাপ্য বড় বড় বিদেশী গাছের জটলা। লোকটি তেমনি একটা গাছের গায়ে কান পেতে কি শুনছিল। ছোটবেলায় যেমন করে টেলিগ্রাফের পোষ্টে কান পেতে হাওয়ার সাঁই সাঁই আওয়াজ শুনতাম। কিংবা একজন ইটের টুকরো ঠুকে সংকেত পাঠাতাম, অন্যরা দূরের দূরের টেলিগ্রাফের থামে কান পেতে তা শুনতাম।



কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পরে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম।
একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সে যেন কি করছে!

'পুপেদা, আমি বোধহয় চিনতে পেরেছি—লোকটা কে।' মিঠুর গলা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল।

'চেনা! বলিস কি?'

'হ্যাঁ চেনা!' মিঠু জোরের সঙ্গে বললো, 'ছাখো তো, তোমার শিবুদাছু নাকি?'

আমি শিবুদাছুর নাম শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। চমকে উঠলাম। মিঠু আমার একটা হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ওকে সুদ্ধ গাছের ছায়ায় ছায়ায় গা মিলিয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। মূর্তিটির সঙ্গে তখন আমাদের দূরত্ব খুব সামান্যই। জ্যোৎস্নার আলোয় এখন তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে-পড়া টল ফিগার। সেই লম্বা সাদা চুল, দাড়ি আর গোঁফে মহর্ষি মহর্ষি চেহারা ভুল হবার নয়। মিঠুর সত্যি নজর আছে!

কিন্তু শিবুদাছুর তখনো হুঁশ নেই। আমরা যে এত কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করছি, তিনি বোধহয় কল্পনাও করতে পারেননি।

এমন সময় নির্জনতা ভঙ্গ করে বিচিত্র সব আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো। কি পশু কে জানে—প্রথম ডেকে উঠতেই, কয়েকটা বুনো পাখিও যোগ দিল সেই সঙ্গে। প্যাঁচাও আছে তার মধ্যে। বুনো কুকুরেরা ডেকে উঠলো কাছেই কোথায়। সঙ্গে সঙ্গে হায়েনার অট্টহাসি ঢেউ তুলে ছড়িয়ে গেল। শেষে সকলের বেয়াদপির ওপর পশুরাজ টেনে দিলেন গোটা দুই গর্জন। মনে হলো সমস্ত বনভূমির আকাশ ভূমিকম্পের মত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো একের পর এক অচেনা ভয়াল শব্দে। আর তার প্রতিধ্বনি পায়ের তলায় মাটির মধ্যে গুমড়াচ্ছে।

এই হিংস্র বনভূমির মধ্যে নিরস্ত্র অসহায় অন্ধের মত দাঁড়িয়ে আছি আমরা—মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি—এমন মনে হতেই হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই আবার

মনের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে নিলাম। দেখি, শিবুদাহু অন্য আর একটা গাছের গুঁড়িতে কান পেতে দাঁড়িয়ে আপন মনে কি বকে চলেছেন। কথাগুলো বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ একটা গাছের গায়ে কান লাগিয়ে আবার অন্য গাছের কাছে সরে গেলেন। সেখানেও সেই একই কাণ্ড করলেন।

'শিবুদাহুর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রে, মিঠু? রাত দুপুরে বাগানে বেরিয়ে এসে একি কাণ্ড শুরু করেছেন? না, বুড়োকে বাহাত্তুরে ধরেছে!'

কথাটা বলেই মনে পড়লো, শিবুদাহুর নিজের হিসেব মত বাহাত্তর কবে ছাড়িয়ে এসেছেন, এখন তাঁর বয়স অন্ততঃ আশীর কোঠায়। কিন্তু শিবুদাহু কি কাল রাতে তাহলে নিজের বাড়িতে ফেরেননি, এখানেই ছিলেন? মিঠুর দেখায় ভুল না হলে আমার ঘর থেকেই বা বেরিয়ে এলেন কি করে। কাল রাতে শোবার আগে ঘরের দরজা আমি নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম।

মিঠু এমন সময় মাথা নেড়ে বললো, 'শিবুদাহু তোমার গাছেদের ডাক্তার বনে গেছেন। স্টেথোস্কোপের বদলে কেমন শুধু কান ঠেকিয়েই ওদের বুক পরীক্ষা করছেন, দ্যাখো।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো ভেবে দেখতে হয় কতরকমের ডাক্তার আছে এই দুনিয়ায়। মানুষের ডাক্তার, গরু-ঘোড়ার ডাক্তার, গাছের ডাক্তার। শিবুদাহু হচ্ছেন আমাদের গিয়ে বটা-নিক্যাল ডাক্তার। কি বলিস'—নিচু গলায় সাবধানে হাসতে লাগলাম। যদিও শিবুদাহু আবার কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিলেন।

'পুপেদা, হেসে উড়িয়ে দিও না আমার কথাটা। জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন, গাছেদেরও শরীরের সুখদুঃখু আছে, মন-প্রাণ, বেদনাবোধ আছে'—

'অস্বীকার তো করিনি। রবিঠাকুরও এক কবিতায় বলেছেন, হে বৃক্ষ আদি প্রাণ! কিন্তু শিবুদাহুর এই ব্যাপারটা রহস্যময়। তিনি এইসব আদি প্রাণের কাছে এত চুপিচুপি রাত দুপুরে কেন?'

আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। শিবুদাদুর ওপরে একটুক্ষণ নজর ছিল না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, ভ্যানিশ!

মিঠুও হঠাৎ তাকিয়ে বললো, 'এই যাঃ!'

আমরা তখন ছুটতে ছুটতে সেই গাছগুলোর তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নেই! চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করে তাকালাম। কোথায় কে? জ্যোৎস্নায় যেন শিবুদাদু ধুয়ে মুছে ভেসে গেছেন। কোথাও তাঁর চিহ্ন মাত্র নেই।

বললাম, 'এ কি চোখের ভুল, না স্বপ্ন?'

মিঠু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো, 'যা বলেছ!'

বলে জোরে জোরে বার দুই-তিন নিঃশ্বাস টানলো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা পেলাম।

'পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

শিবুদাদুর অতিকায় পাইপের তামাকের গন্ধটা আমার কাছে ভুল হবার নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা আমার বিছানার পাশে বসে তিনি তামাক খেয়েছেন। গাছের গুঁড়ির কাছে নাক নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলাম। গন্ধটা যেন ময়াল সাপের মত গাছের গুঁড়ির গায়ে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। স্পষ্ট, কোনো ভুল নেই।

ফের বললাম, 'শিবুদাদুর হাতে বোধহয় পাইপ ছিল। বোধ হয় তামাক খাচ্ছিলেন। এ গন্ধ আর ভীষণ চেনা।'

মিঠু টর্চ জ্বাললো।

না, কোনো চিহ্নই নেই। চুরুটের টুকরো কিংবা পাইপের ছাই-ফাই কিছু পড়ে নেই গাছতলায়। গাছের গায়ে শুধু নেম-প্লেট জ্বলজ্বল করছে। তাতে কেবল গাছের নামই নয়, তার পরিচয়ও আছে। গাছের মত নিরীহ সরল বন্যপ্রাণীর এমনধারা বিদঘুটে নাম কেন যে হয় কে জানে। আসলে বটানিক্যাল নামগুলোই ওরকম বিচ্ছিরি হয় আমি দেখেছি। ল্যাটিন থেকে

বোধহয় নামগুলো এসেছে। অমন জিলিপির প্যাঁচের মত প্যাঁচালো বানান, রেশনের লাইনে দাঁড়ানোর মত গাদাগাদি কনসোনেণ্ট বানান বা উচ্চারণ করে কার সাধ্যি! আর মানে বোঝা? সে শ্রীশ্রীডিক্সনারি ছাড়া আর কারো কম্ম নয়।

'পুপেদা, গাছে তামাকের গন্ধ তো পাওয়া গেল, কিন্তু রহস্যের গন্ধটা এখনো তো ঠিক—'

'অ্যাসিস্ট্যাণ্ট!' আমি ভর্ৎসনার সুরে বলি, 'এখন ইয়ার্কি মারার সময় নয়। শুধু জেনে রাখ, রহস্য এমনই একটা ব্যাপার যে, সেটা দেখতে শুনতে বা শুঁকতে পাওয়া মোটা চোখ-নাক-কানের কর্ম নয়। আপাততঃ এইটুকু বলতে পারি, এই গাছগুলো আফ্রিকার কোনো বিশেষ অঞ্চলের গাছ। আর তোমার স্মরণ থাকতে পারে, শিবুদাদু একসময় চাকরির সূত্রে আফ্রিকায় ছিলেন।'

'আফ্রিকায় ছিলেন?' মিঠু চোখ বড় বড় করে ন্যাকা সাজলো কিনা ঠিক ধরতে পারলাম না।

তাই ব্যাপারটা আদপে গায়ে না মেখে বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার একটা মহৎ দোষ এই যে, কখনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শোনো না। উনি কতবার সেই গল্প বলেছেন।'

চাঁদটা ইতিমধ্যে ঢলে পড়েছিল।

একটা বিরাট বাদাম গাছের কাঁধের আড়াল থেকে তার ঈষৎ লালচে মুখটা উঁকি মারছিল। রাত এখন শেষের দিকে। ঝিল থেকে ঝড়ো ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল থেকে থেকে। আমার খুব শীত-শীত করছিল। সদ্য অসুখের ধাক্কায় শরীরটা এমনিতেই কাহিল।

বললাম 'চ, এবার বাড়ি ফিরে যাই। মামা জানতে পারলে খুব রাগ করবে।'

'হ্যাঁ চলো।' মিঠু নিশ্বাস ফেলে বললো, 'তোমাকে বাইরে নিয়ে এসে ভাল করিনি।'

আমি বললাম, 'ধ্যাত্তেরি! কিস্‌সু হবে না। ডিটেক্‌টিভদের কত অমন—' আমার কথা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। সামান্য কয়েক গজ তফাতে হেলেদুলে একটা বিরাট প্রাণী আসচে দেখতে পেলাম। ভয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমরা দুজনে গাছের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে থাকলাম। জ্যোৎস্নার আলোয় আমাদের সাক্ষাৎ মৃত্যুকে এবার আমরা চিনতে পেরে গিয়েছিলাম। একটা প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক সেটা।

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। এক একটা সেকেণ্ডকে অন্ততঃ পাঁচ মিনিটের মত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। অবশেষে আমাদের ফাঁড়া কাটলো। প্রায় গায়ের কাছ দিয়ে সেই বিরাটকায় প্রাণীটা মন্থর গতিতে চলে গেল।

'স্ট্রেঞ্জ!' মিঠু আমার হাতে রূপোলী ঝিনুকের মত ম্যানিকিওর করা নখ বিঁধিয়ে দিল গভীর উত্তেজনায়।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'শুধু স্ট্রেঞ্জ? হাউ ডেঞ্জারাস! খাঁচা থেকে বেরোলো কি করে?'

'নিশ্চয়ই কেউ খাঁচার দরজা খুলে রেখে দিয়েছে।'

'তাহলে তার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। এই ভুলের কোনো ক্ষমা নেই।'

'কিন্তু ভালুকটা জু গার্ডেন থেকে বেরিয়ে পড়বে না তো?'

'ফটক নিশ্চয়ই বন্ধ থাকে?'

'খাঁচার দরজাও তো জানতাম বন্ধই থাকে।'

'তবে চল্‌, একবার খাঁচাটা দেখে আসি।'

'কিন্তু পুপেদা!' হঠাৎ বেশী রকম ভীত শোনায় মিঠুর গলাটা।

'কী হলো?'

'চিড়িয়াখানায় শ্বেত ভালুক কিন্তু একটা নয়, এক জোড়া! এক খাঁচারই তারা বাসিন্দে।'

'আর একটাও তাহলে ওই ভাবে বেরিয়ে আসতে পারে, এই তো?'

মিঠু শব্দ করলো না, শুধু ঘাড় কাত করলো। জ্যোৎস্নায় তার মুখখানা ভীষণ ফ্যাকাশে মনে হলো।

'সেইজন্যেই তো আগে খাঁচাটা দেখে আসা প্রয়োজন।' আমি মিঠুকে বোঝাই, 'যদি অন্য ভালুকটা এখনো খাঁচাতেই থেকে থাকে, তাহলে সহজেই সাবধান হতে পারবো।'

যুক্তিটা মনে ধরায় মিঠু তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যায়। দু'জনে তাড়াতাড়ি লেকের ব্রীজের ওপর দিয়ে শর্টকাট করে ভালুকের ঠাণ্ডী খাঁচার সামনে পৌঁছালাম। পৌঁছেই বেজায় অবাক হয়ে গেলাম একটা দৃশ্য দেখে।

'একি পুপেদা! একি ব্যাপার?'

ব্যাপারটা সত্যিই চমকপ্রদ। রহস্যটা আমার মাথায় ঠিক ঢুকছিল না। শেষ জ্যোৎস্নার ঠাণ্ডা আলোয় ভালুক-যুগল দিব্যি খোশ-মেজাজে নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে দু'টি লোক আপাদমস্তক সাদা কম্বল মুড়ি দিয়ে সশব্দে ঘুমোচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দরজা পরীক্ষা করলাম। দরজা মজবুত রকমে বন্ধ।

'পুপেদা, এ যে ভৌতিক কাণ্ড একেবারে! এখন চিড়িয়াখানায় মাত্তর একজোড়াই সাদা ভালুক আছে। সে জোড়াও তো দেখছি দিব্যি আরামে বরফ গলা জলের কিনারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।'

আমি আর ওকে ভয় দেখালাম না। বলতে পারতাম— মিঠু, এই চিড়িয়াখানায় সত্যিই ভূতুড়ে কাণ্ড হচ্ছে। আমি একাধিক রাত্রে ভৌতিক জীবজন্তু দেখেছি। একটু আগে যে ভালুকটা আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে সে কক্ষনো জ্যান্ত প্রাণী নয়, ভূত। ভালুক-ভূত।

মুখে বললাম, 'ধ্যুর!' তারপর হাতের ইশারায় আমার পিছনে আসতে বলে আবার সেই ব্রীজের ওপর দিয়ে ফিরে ছুটলাম। ভালুকটাকে চোখের আড়ালে ছেড়ে আসা উচিত হয়নি। মিঠুকে তখন দাঁড় করিয়ে রেখে এলেই বোধ করি ভাল হতো। দূর থেকেও

অন্ততঃ ভালুকটার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারতো। এখন ফিরে গিয়ে আবার খুঁজে পেলে হয়।

যতদূর কম শব্দ হয় এমনিভাবে পা ফেলে ছুটছিলাম দু'জনে। দু'জনের কারো পায়েই জুতো ছিল না এই যা সুবিধে। শিবুদাদুর কান পেতে শোনা গাছগুলোর তলায় পৌঁছেও থামলাম না। ঘাসের জমি, ফুলের বেড, খাঁচাঘর পার হয়ে একটা খোয়া-পেটা রাস্তা ধরলাম। পথটা কিছুদূর এগিয়েই একসার খাঁচার কম্পাউণ্ডের সামনেকার রেলিং ছুঁয়ে শেষ হলো।

কিন্তু আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সে কই? আশেপাশে তার কোথাও চিহ্নমাত্র নেই। অথচ এই পথেই সে গিয়েছিল আমি লক্ষ্য করেছিলাম। এপাশে কোনো দ্বিতীয় পথ নেই।

খাঁচার সারির সামনে কয়েক গজ করে আঙিনা। বছরের অন্য সময় এই উঠোনগুলি ঘাসে ছেয়ে থাকে, কিন্তু এখন এই প্রখর গ্রীষ্মে ঘাস মরে গিয়ে শুকনো মাটি বেরিয়ে পড়েছে। হরিণ বা ঐ জাতীয় কোনো প্রাণীদের অবিরাম চলাফেরায়, পায়ের শক্ত ক্ষুরের ঘষা লেগে লেগে মাটি খানিকটা আলগা ধুলোর চেহারা নিয়েছে।

লোহার শিক আর মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা, বুক-সমান উঁচু বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আমি চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম। দিনের বেলায় যে প্রাণীগুলো এই কম্পাউণ্ডের মধ্যে চরে এবং ঘুরে বেড়ায়, তারা এখন খাঁচার ঘরে ঘুমোতে গেছে। এত দূর থেকে খাঁচার ভেতরের কিছু ঠাহর করার উপায় নেই।

জ্যোৎস্না মরে এসেছে। চাঁদ চিড়িয়াখানার পাঁচিলের ওপরে বসে ডাইভ খেয়ে ওপিঠে অদৃশ্য হওয়ার তালে আছে। গাঢ় ছায়ার ঢল নেমে এসেছে তেরচা হয়ে খাঁচার সামনের উঠোনে। চোখ চলে না। রাতের অন্ধকারে সব পশুদেরই চোখ কম-বেশী জ্বলে কিন্তু সে জ্বলজ্বলে চোখগুলোরও মালুম পাওয়া গেল না।

'ভালুকটা তাহলে ভ্যানিশ হয়েই গেল, পুপেদা? কিন্তু এত

তাড়াতাড়ি গেলই বা কোথায় !'

মুখে না বললেও কথাটা আমিও ভাবছিলাম। যেতে আসতে আমরা একটুও সময় নষ্ট করিনি। লেকের কোমরের কাছটায় জল যেখানে সরু হয়ে প্রায় একটা নালার রূপ নিয়েছে, সেখানকার ব্রীজ দিয়ে ওপারে যেতে আর কতটুকুই বা বিলম্ব হয়। তাও বলতে গেলে দৌড়ে গেছি, ছুটে এসেছি। অথচ এরই মধ্যে অতো বড় প্রাণীটা, অমন মন্থর চালে হেঁটেও চোখের আড়ালে চলে গেল ! এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার।

এখানে পথটা খাঁচার বেড়ার গায়ে নাক ঠেকিয়ে ফুরিয়ে গেছে। ভালুকটা যদি এ পর্যন্ত না এসে ডাইনে বা বাঁয়ে মোড় নিয়ে মেন গেটের দিকে কিংবা শিম্পাঞ্জী আইল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে রেপটাইল হাউসের দিকে যাবার চেষ্টা করতো, তাহলে এত শিগগীর কখনোই যেতে পারতো না। তবে কি একটু আগে যা ভেবেছি তাই ? এটা সত্যিই ভূতুড়ে কাণ্ড ? গায়ে একটু শিরশির ভাব জাগলো এই শেষরাতে কথাটা ভাবতে। গো-ভূত কিংবা কুকুর কি বেড়াল-ভূতের কথা শোনা আছে, কিন্তু ভালুক-ভূতের সঙ্গে একেবারে স্বচক্ষে মোলাকাত হলো।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে এইসব আজগুবি ভাবছিলাম, এমন সময় মিঠুর ডাকে চমক ভাঙলো আমার।

'পুপেদা, পুপেদা, গ্যাখো ! গ্যাখো !' সরু পেন্সিল-টর্চের আলোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেড়ার একটা বিশেষ জায়গায় ফেলে সে কিছু দেখছিল। আমি একলাফে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নতুন রঙ-করা লোহার জালের গায়ে একগোছা সাদা লোম লেগে রয়েছে। আমি কোনো কথা বললাম না। ওর হাত থেকে টর্চটা টেনে নিয়ে খাঁটি ডিটেকটিভের মত ভ্রূ কুঁচকে বেড়ার গায়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। আমার মন ইউরেকা ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে উঠতে চাইছিল, কিন্তু ঠোঁট চেপে থেকে আমি রহস্যটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম।

মিঠু আমার কানের কাছে একঘেয়ে নিচু গলায় কি সব বকে চলেছিল। আনাড়ি অ্যাসিস্ট্যান্টরা অনেক সময় অমন অনাবশ্যক বকবক করেই থাকে। কিন্তু তাতে খোদ গোয়েন্দার কর্ণপাত করলে চলে না। আমিও করছিলাম না। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা কানের পাশ দিয়ে ফস্কে বেরিয়ে যেতে যেতে কি করে কানের মধ্যে ঢুকে গেল।

'আজ বিকেলেই দেখছিলাম এই বেড়াটা রঙ করা হচ্ছে।' মিঠুর কথায় চমকে উঠলাম।

তাই তো! তাহলে তো, আমার সন্দেহের একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। কোনো ভুল নেই আমার অনুমানে। এই পশমের গোছা শ্বেত ভালুকের গা থেকেই এসেছে। ভালুক গাছে উঠতে পারে। এই সামান্য বেড়া ডিঙোনো তার পক্ষে খুব কঠিন মনে হয় না। এই বেড়া ডিঙিয়েই সে ভেতরে গেছে।

বেড়ার গায়ে যেখানে দু'খণ্ড তারের জাল জোড়া দেওয়া হয়েছে, সেই জোড়ের মুখে আটকে গিয়ে লোমের গোছা ছিঁড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছেঁড়া লোমগুলো মাটিতে পড়ে যায়নি। চটচটে আঠালো নতুন রঙের সঙ্গে আটকে গিয়ে নূর দাড়ির মত ঝুলছে।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এই লোম ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাটা অত্যন্ত টাটকা, অন্তত আজ সন্ধ্যার পরে ঘটেছে। আর আমাদের দেখা ভালুকটাও ভূতপ্রেত নয়, জ্যান্ত এবং রিয়্যাল ভালুক। শুধু চিড়িয়াখানায় এই তৃতীয় ভালুকটির আগমন কোথা থেকে হলো সেটিই দুর্বোধ্য রয়ে গেল।

পেন্সিল-টর্চের আলোও খুব কাছে ফেললে বেশ জোরালো হয়। সেই আলোয় তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি আরও একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলাম। রেলিংয়ের মোটা পাইপের গায়ে স্পষ্ট মানুষের আঙুলের ছাপ পড়েছে। ব্যাপারটা কি হতে পারে ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকলো না। অন্যমনস্কভাবে শুধুই তাকিয়ে থাকলাম হাতের ছাপটির দিকে।

,অত কি দেখছো, পুপেদা ? কোনো সূত্রটুত্র পেয়েছো নিশ্চয় !'

বললাম, 'তা পেয়েছি মনে হচ্ছে।'

,অ্যাঁ, পেয়েছো সত্যিই ? কি ? কি পেয়েছো ?' মিঠু রেলিঙের ওপর ঝুঁকে এল।

,হাতের ছাপ।' আমি জানাই।

,ওঃ, এই!' মিঠু ঠোঁট ওল্টায়, 'হাতের ছাপ মানে তো মানুষের। তার সঙ্গে আমাদের ভালুকের কি সম্পর্ক ?'

'সম্পর্ক প্রয়োজন হলে খুঁজে বের করতে হয়।'

'এই হাতের ছাপ তো রঙের মিস্ত্রীদেরও হতে পারে ? যারা আজ বিকেলে বেড়াটা রঙ করছিল।'

'তা পারে। না, না, তা বোধহয় পারে না। এ রঙের মিস্ত্রীদের কারো নয়।' আমি হঠাৎ আরও কিছু তথ্য প্রমাণ যেন দেখতে পেয়ে যাই, 'এই ছাপ অত্যন্ত টাটকা। বোধহয় এক্ষুনি কেউ বেড়া টপকেছে। ভালুকটির পিছু পিছু।'

'এত কথা কি করে জানলে ?' মিঠু সন্দেহ এবং সমীহ প্রকাশ করে।

,ভালুকের গায়ের দু'চারটি রোঁয়া এই হাতের ছাপের মধ্যে আছে। এটাই প্রমাণ। যদি আমার হাতে আতস কাচ থাকতো তাহলে তোকে হয়তো আরও—'

আমার কথাটা শেষ করলাম না, চমকে থেমে গেলাম। আতস কাচ ছাড়াই আমি আরও কিছু দেখতে পেয়ে গেলাম।

'আবার কি হলো ?' মিঠু আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলে।

,ক'জন রঙের মিস্ত্রী এখানে কাজ করছিল রে ?'

'কেনা ? দু'জন।'

'চিনিস তাদের ?'

'না, পুপেদা। কেন একথা বলছো খুলে বলো ?'

'ওদের কারো হাতে ছ'টা আঙুল আছে কিনা আমার জানা

খুব দরকার। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের গা থেকে একটা মিনি আঙুল বেরিয়েছে।'

,রীতিমত যে হেঁয়ালি ছাড়তে শুরু করলে, পুপেদা!

,পুপেদা হেট্‌স হেঁয়ালি।' ঠোঁটে যেন পাইপ চাপা আছে এমন চাপা গম্ভীর গলা করে আমি জবাব দিই, 'আচ্ছা অ্যাসিস্ট্যান্ট, এই খাঁচায় কোন্ ভদ্রজীব বাস করেন জানা আছে?'

মিঠু এবার খোলা গলায় হি হি করে হেসে উঠলো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ধমক লাগালাম, 'হাসি রাখ! আই ওয়াণ্ট ইনফরমেশন—আমার খবর চাই।'

হাসি থামিয়ে মিঠু বললো, 'কাল বলতে পারবো তোমার ছ' আঙুলের বৃত্তান্ত। কাল ওরা পাশের খাঁচা রঙ করতে আসবে। আজ ক'দিন ধরেই ওরা রঙের কাজ করছে।' কথা থামিয়ে আবার একটুখানি ফিক করে হেসে নিয়ে ফের বললো, 'তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে আমাকে জানাতে হচ্ছে, এই কোয়ার্টারের ভদ্রলোকটি কিছুকাল আগে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেছেন। সেই অবধি বাসা খালিই রয়েছে।'

'বটে বটে!' আমি উল্লসিত হই, 'তুমি ঠিক জানো?'

'জানি। কিন্তু তোমার কি বসবাসের ইচ্ছে আছে এখানে?'

মিঠুর রসিকতা আমি উড়িয়ে দিলাম, কানেই নিলাম না কথাটা। একটু চিন্তিত থেকে বললাম, 'এবার তুমি ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে যাও। আমি নতুন এক অ্যাডভেঞ্চারে নামবো।'

'মেয়ে বলে আমাকে অত ইগ্‌নোর করো না, পুপেদা। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন?' মিঠু বেঁকে বসলো।

অগত্যা তু'জনে মিলেই বেড়া টপকাবো স্থির করলাম। ঠিক হলো মিঠু আমার পিছন পিছন আসবে। ভালুক যদি ভেতরে থাকে এবং তেড়ে আসে, আমি সেটাকে যে কোনো উপায়ে কিছুক্ষণ আটকে রাখবো। সেই অবসরে মিঠু পালিয়ে গিয়ে মামাকে খবর দেবে।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর বেড়া টপকাতে হলো না। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম বেড়ার জোড়ের জায়গাটা নিছক ফাঁকি। সেটা মোটেই জোড়া দেওয়া নয়, ঠেললে ফাঁক হয়ে যায় পিছনের গরাদে দু'খানা সুদ্ধু। সে দুটোর গোড়া কেউ করাত দিয়ে কেটে রেখেছে, কিন্তু তারের জালের সঙ্গে বাঁধা থাকায় ধরবার জো নেই।

এই আবিষ্কার কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে স্ট্যাচু বানিয়ে দিল। মনে মনে আমি একটা অঙ্ক মেলাচ্ছিলাম, কিন্তু তার মধ্যে সাদা ভালুকটার অনধিকার প্রবেশ সব গোলমাল করে দিচ্ছিল। এটা কি তবে পোষা ভালুক? কেউ কি তাহলে এর সঙ্গে সঙ্গে ছিল? রাত্তির বেলায় চিড়িয়াখানার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা পোষা ভালুককে নিয়ে কারো ঘুরে বেড়ানোর কি যে সার্থকতা থাকতে পারে, কিছুতেই মাথায় ঢুকলো না।

যাই হোক, আমরা ঢুকে পড়েছিলাম কম্পাউণ্ডের মধ্যে। এবার চোখ-কান সজাগ রেখে পা টিপে টিপে খাঁচাটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভেতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। উকিঝুঁকি দিয়ে যতদূর অনুমান করা গেল, খাঁচা শূন্য—জনপ্রাণী কিছুই নেই। সাহস করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আশপাশ সব দেখে নিলাম।

ছোটখাটো খুব নিচু সিলিং-এর ঘর। তিনদিকে দেওয়াল, কিন্তু সামনেটা খোলা। কোনো দরজা জানালা নেই। মেঝেটার জায়গায় জায়গায় সিমেণ্ট উঠে তলাকার মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ঘরটার মধ্যে কিচ্ছু নেই, শুধু একটা বোঁটকা গন্ধ ছাড়া। আগে এখানে কোন্ জন্তু ছিল কে জানে, এখন বুঝি তার গন্ধটাকেই খাঁচায় পুষে রাখা হয়েছে।

'পুপেদা, ভালুকটা গেল কোথায়?'

আমি মাথা চুলকে বললাম, 'তাই তো! খাঁচার মধ্যে ঢুকেছিল বলেই তো সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি —'

আমার কথাকে মাঝপথে কেটে দিয়ে মিঠুর গলা দিয়ে আর্তনাদ

বেরোলো। চমকে তাকালাম। হাই জাম্প, লং জাম্প, ব্রড জাম্প সব একসঙ্গে জড়িয়ে গেলে যে বস্তু দাঁড়ায়, মিঠু অনেকটা সেইরকম ভাবেই লাফিয়ে উঠলো। এবং তার পরেই পপাত ধরণীতলে।

মিঠুর এই আকস্মিক ভীতিকর পতনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য টর্চ ফোকাস করলাম, 'কী হলো রে মিঠু?'

মিঠু চিৎপাত অবস্থায় পড়ে থেকেই করুণ গলায় জানালো, 'পুপেদাদা গো, আরশোলা!'

আমি কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, 'ভূত গেল, ভালুক গেল, শেষে আরশোলাতেই কুপোকাত!'

আমি বিরক্ত মেজাজে ওর হাত ধরে টেনে তুলে আরশোলা খুঁজতে থাকি। কিন্তু আরশোলা পাওয়া যায় না। তার বদলে ওর পায়ের কাছে মেঝেয় একটা আধলা সুপুরির সাইজের মাকড়সা দেখতে পাই। টর্চের আলো ফেলামাত্র ঘরের কোণের দিকে ছুটে পালালো।

'ওঃ মাকড়সা, তাই বলো!' মিঠু যেন আবার তার মনের বল-ভরসা ফিরে পায়।

মাকড়সাটাকে অনুসরণ করে আমার চোখ গিয়ে পড়লো ঘরের কোণের প্রকাণ্ড জালখানার দিকে। নতুন জাল, বোধহয় এই মাকড়সাটিরই সম্পত্তি। কারণ অপর কোনো মাকড়সাকে ধারেকাছে দেখতে পেলাম না।

হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হলাম।

টান-টান করে টাঙানো এই নীট জালটার একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়ে গিয়ে সূক্ষ্ম নেটের ওড়নার মত ঝুলছে।

আমি রীতিমত গোয়েন্দা-দৃষ্টিতে কারণটা খুঁজে দেখতে লাগলাম। নতুন জাল, সুতোর গ্রেজ দেখেই বোঝা যায়, কিন্তু ছিঁড়লো কি করে। খোলা জায়গা নয় যে, ঝড়-বাতাসে ছিঁড়ে যাবে। জনপ্রাণী কেউ নেই। আমরাও ঘরের এই কোণের দিকে যাইনি। তবে? গোয়েন্দাকে তুচ্ছ জিনিসের দিকে নজর দিতে

হয় বিশেষ করে। সূত্রটূত্র, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লু, তা অনেক সময়ই তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। সুতরাং এই মাকড়সার সূত্রও রহস্যের সূত্র হয়ে দেখা দিতে পারে, কিছু আশ্চর্য নয়। আমি এই ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলাম। মাকড়সাটা নাকি প্রথমে মিঠুর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। আমি সিলিং-এর দিকে তাকালাম। এই সামান্য আলোয় দেখা গেল না কিছু, কিন্তু অনুমান করলাম মাকড়সাটি সিলিং-এর মাঝামাঝি জায়গা থেকে নিজের সুতোয় ভর করে নিচে নামছিল। তার সেই ঝুলন্ত অবস্থায় মিঠুর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এখন সে আবার নিজের জালে ফিরে গেছে।

তাহলে মাকড়সার জালটি খুব সামান্য আগে ছিঁড়েছে এমনি মনে হয়। যে ভাবেই ছিঁড়ুক, জাল ছেঁড়ার ঘটনায় ভয় পেয়ে মাকড়সাটি মাঝ সিলিং-এ পালিয়েছিল। যদি এটা কয়েকঘণ্টা আগের ঘটনাও হতো, তা হলে মাকড়সাদের যা স্বভাব, তাতে এতক্ষণে জালটা আবার রিপেয়ার করা হয়ে যেত। ওরা ওস্তাদ কারিগর, কখনো কুঁড়েমি করে না।

আমার হঠাৎ মনে হলো, সাদা ভালুকটা তাহলে কি এই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল? কিন্তু যদি ঢুকেইছিল, সে এত তাড়াতাড়ি গেল কোথায়? নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। কিন্তু কোথায় থাকবে? এ-ঘরে একটা কাঠবেড়ালীরও লুকোবার মত জায়গা নেই।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিল আমার।

৮ ॥

বাংলোর হাতায় সবে ঢুকেছি, অমনি কোথা থেকে চাপরাশী শিউপ্রসাদের উদয় হলো। তার কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মত বাঁকানো গোঁফজোড়া নিয়ে স্যালুট করে দাঁড়ানো দেখেই আমার পিলে চমকে গেল। কারণ শিউপ্রসাদ বিনা কারণে সেলাম দেয় না। বাড়িতে যখনই দেখা হয়, তার চুমড়ানো গোঁফের তলায় একটুখানি হাসে মাত্র। কিন্তু যখনই সে সাহেবের অর্থাৎ অশ্বিনীমামার হুকুম নিয়ে আসে, তখনই তার লোহার নাল পরানো জুতোজোড়া খটাস করে গোড়ালিতে গোড়ালিতে জুড়ে যায়। হাতখানা রগের পাশে উঠে আসে বাস-ড্রাইভারের জানালায় বাড়ানো লোহার হাতের মত। সে মামা হোক, কি আমি কিংবা উৎফুল্ল যেই হোক, সেলাম থেকে নিস্তার নেই।

নিজেকে সামলে নিতে তখনো পারিনি, শিউপ্রসাদ আমার হাতের মধ্যে একখণ্ড কাগজ গুঁজে দিল। ভাঁজ খুলতেই ভোরের আবছা আলোয় অশ্বিনীমামার কালোজিরের মত শ্রীহস্তাক্ষর দেখতে পেলাম। ইংরেজিতে লেখা। বাংলা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

'মহাশয়ের একবার বৈঠকখানায় আসতে আজ্ঞা হোক।'

মিঠুও উঁকি মেরে দেখে নিয়েছিল চিঠিটা। চোখের ইশারায় মিঠুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি পিঁপড়ে পায়ে বৈঠকখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঙাল জলধর আমার জন্যে পর্দা তুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল। এবার সামনাসামনি পেয়ে তরমুজের বীচির

মত রঙীন দাঁতগুলো বের করে নিঃশব্দে একচোট হেসে নিল।

আমি মনে মনে জলধরের মুণ্ডুপাত করে ভেতরে ঢুকলাম। এমন হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার পিছনে কার হাত, কাদের ষড়যন্ত্র কাজ করেছে, অনুমান করতে চেষ্টা করলাম। তবে যে-ই থাক বা যারাই থাক, জলধর যে তার বা তাদের সঙ্গে জড়িত আমার সন্দেহ থাকলো না।

ঘরের মধ্যে তখন দু'জন মানুষ। অশ্বিনীমামা সোফায় বসে আছে। সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর এক পেয়ালা কফি জুড়োচ্ছে। পরনে সেই চক্রাবক্রা বুশশার্ট, শর্টস, পায়ে টেনিস জুতো, গলায় কালো কারে বাঁধা বাইনোকুলার। মস্তবড় ছ-কোনা রোদচশমাটা নাকে চড়বার অপেক্ষায় টেবিলের ওপর পড়ে আছে। মামা চুরুটের চামড়ার খাপটা খুলে মনোযোগ দিয়ে কি দেখছে।

ওপাশের দেওয়ালে গণ্ডারের মুণ্ডুর তলায় খাড়া-পিঠ একটা চেয়ারে ধ্যানী বুদ্ধের মত একটি মূর্তি বসে আছেন। হাতে একফুট লম্বা একটা পাইপ থেকে নীলচে ধোঁয়ার স্থির শিখা উঠে গণ্ডারের স্ফীত নাকের ফুটোর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আমি চমকে উঠলাম, রহস্যের মেঘনাদ শিবুদাদু এখানে এভাবে বসে আছেন দেখে!

মামা আমার দিকে তাকায়নি, শিবুদাদুও তাকালেন না। শুধু তাঁর দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে দুষ্টু হাসিটা উঁকি মারছে এমন মনে হলো। কে তাহলে আমাদের রাত্রের অভিযানের কথা ফাঁস করে দিয়েছে, বুঝতে বাকি থাকলো না।

অশ্বিনামামা এবারেও আমার দিকে না তাকিয়ে শুধু হাতের ইঙ্গিতে আমাকে মুখোমুখি বসতে বললো। বসে পড়লাম বাক্যব্যয় না করে। মামা এমনিতে খুব জলি, খুব মাই-ডিয়ার। কিন্তু রেগে গেলে, গম্ভীর হয়ে গেলে একেবারে অন্যমানুষ।

'তারপর লিট্ল ডিটেকটিভ?' মামা খাপের ভেতর থেকে তার পছন্দ করা চুরুটটাকে বের করতে করতে বললো।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। শুধু গলা দিয়ে

অস্পষ্ট রকম একটা শব্দ বেরলো। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মামা তাকালো এবার, 'তোমার তদন্তকার্য কেমন এগোচ্ছে?'

মামার মতিগতি কিছু বুঝতে না পেরে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। আমার এ-যাবৎ কালের চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে মামা কিংবা মামী কাউকে কিছু বলিওনি। তবু মামা কি করে সব টের পেয়ে গেল কে জানে!

'মামা, তুমি কি বলছো, আমি ঠিক—' আমতা আমতা করে বলি।

চুরুটের গোড়াটা দাঁত দিয়ে কামড়াতে কামড়াতে মামা আপন মনেই বলে উঠলো, 'কবি এবং সখের গোয়েন্দা উভয়েই কিঞ্চিৎ লাজুক হয়ে থাকে। তোমার শাইনেস্ তাই খুবই স্বাভাবিক। তবে আমাকে লুকিও না, তোমার অ্যানালিসিস আর কদ্দুর এগোলো? ভাল কথা, তোমার কথা মত, লেকের জলে জাল ফেলে বন্দুকগুলোর হদিশ পাওয়া গেছে। ডাকাতরা ভাঙা ক্যাশবাক্সের সঙ্গে পাহারাদারদের বন্দুকগুলোকে ঝিলের জলের মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল।'

মামার এই কথায় আমি ভেতরে ভেতরে চমকালাম। আমার কথা মত! আমি তো কাউকেই এরকম কথা বলিনি। তবে কথাটা যে আমার মনের কথা, অস্বীকার করার উপায় নেই। দিনরাত্তির বিছানায় শুয়ে শুয়ে, আমি চিড়িয়াখানার ডাকাতির প্লটটা ভেবে বের করার চেষ্টা করেছি। আমার কেবলই মনে হয়েছে, পুলিশের ডায়েরীতে এই দুর্ঘটনার বিবরণ যে ভাবে লেখা হয়েছে, ঘটনাটা আগাগোড়া নিশ্চয়ই সেরকম নয়। হয়তো জবানবন্দীগুলোর মধ্যে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি আছে। গাঁজার ব্যাপারটা আমাকে অন্য একটা পথের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

হঠাৎ আমি ভেতরে ভেতরে যেন বিষম খেলাম। মাই গড! বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখা ডায়েরীটা বের করে মামা পড়েছে নাকি? সর্বনাশ! তাতে যে সব কথা খোলাখুলি লিখে রেখেছি।

ভয়ে এবং লজ্জায় আড়চোখে মামার মুখের দিকে তাকাই।

মামা চুরুটের পিছনে কাঠি গুঁজতে গুঁজতে বলে, 'আমার কাছে আর সঙ্কোচ করার কিছু নেই। বলো, বলে ফেল—'

আমি তবু খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলি, 'এই চিড়িয়াখানার ভেতরে-বাইরে জুড়ে একটা বড় রকমের চক্রান্ত চলেছে বলে আমার মনে হয়। জন্তু-জানোয়ার চুরি থেকে শুরু করে ডাকাতি পর্যন্ত সব ঘটনা একসূত্রে বাঁধা।'

'হুঁ। আমার মনেও সেইরকমই একটা সন্দেহ ছিল, তোর সাহায্যে সেটা স্পষ্ট হলো। পুলিশ-সুপার তোর ডায়েরীটা পড়ে খুব খুশী হয়েছেন···খুব তারিফ করেছেন···তোর সম্বন্ধে বলেছেন, তুই নাকি একটা জিনিয়াস। তোর অনুমানের পথেই, তিনি পুলিশী রীতিতে খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন সব কিছু।'

মামা খুব নিচু আর স্থির গলায় কথা বলছিল। কথা বলার সময় তার মুখে কোথাও ভাঁজ পড়ছিল না। ঠোঁট নড়াটাও ভাল করে নজর না করলে কেউ দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। তবু থেমে, মামা একবার দরজার দিকে তাকালো। দরজায় ভারি পর্দা ঝুলছিল, আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জলধর বিদায় নিয়েছিল। পর্দার তলা দিয়ে যতদূর দেখা যায়, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই।

এস-পি আমার ডায়েরীটা কী ভাবে কার মারফত পেলেন, সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমি তাই অন্য কথা পাড়লাম, 'মামা, আমার মনে হয়, চিড়িয়াখানার বাইরে বেরোবার কোনো গোপন রাস্তা আছে—যেটা তুমি জানো না।'

'গোপন রাস্তা!' অশ্বিনীমামা অতি আলগোছে হাসলো, যেন এই মুহূর্তে সে তার সাবান-ফেনানো গালে ধারালো ক্ষুর চালাচ্ছে, 'চিড়িয়াখানায় কোনো গোপন রাস্তা নেই। সব রাস্তাই আমার নখদর্পণে।'

অশ্বিনীমামার কথাটা আমাকে একটু আহত করলো। আমি

মামাকে অগত্যা আজকের অভিযানের ভালুক-কাহিনী শোনালাম। মিঠু যে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল, সেকথা বেমালুম চেপে গেলাম।

শুনে মামার মুখ রীতিমত গম্ভীর হলো। দেশলাইয়ের কাঠি বের করেও আবার বাক্সে পুরে রেখে দিল, চুরুট ধরালো না। বদলে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা টেনে নিল, কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে আমার নাড়ী দেখলো, তারপর মুখ থেকে না-ধরানো চুরুটটা টেনে নিয়ে বললো, 'খুব উইক রয়েছো দেখছি। রাত্রে আবার টেম্পারেচার হচ্ছে না তো?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'উহু, এ অবস্থায় হুট্‌হাট্ অমন বাইরে যাবে না। ছায়া-টায়া দেখে ভয় পেতে পারো। শরীরের এই অবস্থায় চোখের ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

কান-টান গরম হয়ে উঠলো আমার। মামা আমাকে কি ভেবেছে! কচি খোকা? নাকি জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখি? মনের উত্তেজনা গোপন রেখেই আমি বললাম, 'সবই আমার চোখের ভুল নয়, সে প্রমাণ আমি তোমাকে এক্ষুনি দিচ্ছি। তুমি ওঁকেই জিগ্যেস করে ত্যাখো, উনি কিছুক্ষণ আগে—'

তাকিয়ে দেখি, একি! শিবুদাদু কখন নিঃশব্দে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন। মহা চালাক লোক তো! নিজের কথাটি যেই উঠতে যাচ্ছে, অমনি কেটে পড়লেন।

'উনি কে? কার কথা বলছিস র‍্যা?'

আমি ক্ষুব্ধ গলায় জানালাম, 'কেন, শিবুদাদুর! এই এক মুহূর্ত আগেও যিনি ওই চেয়ারটায় বসে পাইপ টানছিলেন।'

'বলছিস কি তুই?' অশ্বিনীমামার মুখটা হাঁ হয়ে গেল এবারে, 'কে শিবুদাদু? এঘরে তো তুই আর আমি ছাড়া আর কেউ···হ্যাঁ হ্যাঁ, আরও একজন ছিল বটে···সে জলধর! কিন্তু তুই আসতেই তো ও বেরিয়ে গেল।'

আমার মুখটা হাঁ হলো এবার, প্রায় গো-গো'র সাইজে। মামা

বলে কি! আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা-মজা করছে না তো? কিন্তু মুখচোখ দেখে তেমন মনে হলো না। মুখে ফের চুরুট গুঁজে দেশলাই জ্বেলেছিল মামা, আমি ফস করে জ্বলন্ত কাঠিসুদ্ধ হাতখানা ধরে ফেললাম।

মামা চমকে উঠে বললো, 'কী হলো?'

নাক দিয়ে শব্দ করে হাওয়া টেনে বললাম, 'গন্ধ পাচ্ছ না?'

মামাও আমার মত করেই বারকতক ঘরের বাতাস শুকলো, 'কিসের গন্ধ? উঃ—'

কাঠিটা পুড়ে এসে হাতে আঁচ লাগতেই সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মামা আঙুলে ফুঁ দিতে থাকলো।

'তামাকের গন্ধ। শিবুদাতু যে পাইপ টানছিলেন এখানে বসে। পাচ্ছ না?'

'তোমার শিবুদাতুই হাওয়াই ব্যাপার, তার ওপরে আবার ধোঁয়া?' মামা হা হা করে হাসলো, 'যাও যাও, ওপরে গিয়ে ঘণ্টা তুই টানা ঘুমিয়ে নাও আগে, তারপরে ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে তোমার আজগুবি গপ্প শোনা যাবে।'

মামার ঠাট্টায় আমার চোখ ফেটে জল আসছিল, আমি কোনোমতে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

দিনের আলোর মত স্পষ্ট শিবুদাতুকে মামা কেন যে না দেখার ভান করলো, বুঝতে পারলাম না। শুধুই এই ভোরের দেখা নয়, শিবুদাতুকে মামা আদৌ চেনে না—বলে দিল তুম করে। অথচ শিবুদাতু আমার অসুখের সময় দিনের পর দিন আমার বিছানার পাশে এসে বসেছেন, কত গল্প করেছেন, একথা সবার মত মামাও নিশ্চয় জানে। আমার পরিষ্কার মনে আছে, আমার ঘর থেকে উঠে যেতে যেতে কতদিন উনি বলেছেন—যাই এবার একটু অশ্বিনী ভায়ার সঙ্গে গল্পসল্প করিগে। কিংবা, যাই একটু রান্নাঘরে তোর মামী কি করছে, দেখে বাড়ি যাই।—

একেবারে অহংকারশূন্য ভাল মানুষ বললে যা বোঝায়, শিবুদাছু তাই। প্রথম দিন কেউ তাঁকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি, তিনি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছিলেন। গল্পপটু মানুষ, গল্প করতে ভীষণ ভালবাসেন। কিন্তু তা বলে তাঁর গল্পগাছায় কারো পড়াশোনার ক্ষতি হয়, এ তিনি চান না। যে জন্যে কোনোদিন গল্পের আসরে মিঠুকে ডাকেননি। ওর কথা তুললেই মুচকি হেসে বলতেন, 'মেয়েটাকে পড়তে দে। তুই এখন আমারই মত বেকার, আয় তোতে আমাতে গল্প করি।'

এ হেন শিবুদাছুকে অস্বীকার করার কোনো মানে হয়!

'কী পুপেদা, এই সক্কাল বেলায় একেবারে চিৎপাত? বাপী নিশ্চয় তোমাকে খুব টাইট্ দিয়েছে।'

'আরে য্যাঃ য্যাঃ,' আমি তিরিক্ষে মেজাজে কথা বলি, 'বেশী ফচকেমি করতে আসিস না। আমার খুশী আমি শুয়ে আছি।'

'তুমি আমার ওপর মিথ্যে-মিথ্যে রাগ করছো, পুপেদা। সত্যি করে খুলে বলো তো তোমার কি হয়েছে?'

মিঠুর সরল চোখমুখের দিকে তাকিয়ে আমি রাগ করে থাকতে পারলাম না। মামার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের খুঁটিনাটি সব বললাম। শুনে মিঠু সঙ্গে সঙ্গে কোনো মন্তব্য করলো না, বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে কি ভাবলো।

শেষে বললো, 'রাগ করো না, পুপেদা, কাল রাতের আগে তোমার শিবুদাছুকে কিন্তু আমিও কখনো চোখে দেখিনি।'

আমি সন্দিগ্ধ গলায় শুধাই, 'বলিস কি, আশ্চর্য?'

'সত্যি, তিন সত্যি। তুমি যখন প্রথম ওঁর গল্প বলতে, আমি ভাবতাম, জ্বরের ঘোরে তুমি যেসব স্বপ্ন দেখতে, সেইগুলো আমাকে বলছো। পরে দিনের পর দিন শুনতে শুনতে কেমন বিশ্বাস হয়ে গেল।'

আমি বেজার মুখে বললাম, 'কিন্তু কাল তো স্বচক্ষে দেখেছো—'

'দেখেছি। তবে জ্যোৎস্নার মধ্যে আবছা আবছা—'

,কিন্তু সেটাও নিশ্চয় স্বপ্ন নয়! চলো খুঁজে দেখলেই তো ফুরিয়ে যায়। দাহু এখনো নিশ্চয় এই বাড়িতেই আছেন।'

বাংলো বাড়িতে শিবুদাহুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এই খোঁজ করতে গিয়ে এক তাজ্জব ব্যাপার জানতে পারা গেল। এ বাড়িতে কেউ শিবুদাহুকে চেনে না, কখনো নাকি দেখেনি। আমার অসুখের সময়ে তিনি যদি আমার কাছে আনাগোনা করেই থাকেন তবে তা করেছেন সকলের অজ্ঞাতেই। কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

এ ব্যাপারটা আমার কাছে রীতিমত ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে হতেই গা-টা কেমন ছমছম করতে লাগলো। সেই সঙ্গে নিজেকে খুব বোকাও মনে হলো। কেননা, শিবুদাহু ঠিক কোথায় থাকেন, কে কে আছে তাঁর, কি সুবাদেই বা তিনি সকলের দাহু, তাঁর পুরো নামটা কি, কিছুই জেনে রাখা হয়নি। অবিশ্যি ওঁর ঠিকানাটা একবার চেয়েছিলাম, লিখে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেননি।

এই সময়টায় রোদের তাতে কোনঠাসা হয়ে, অনেকেই জলার ধারে গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিচ্ছে। কেউ কেউ কোল্ড ড্রিংকস্-এর গুমটির সামনে আইসক্রীম চুষছে। কেউ রঙ-বেরঙের বোতলে স্ট্র ভরে পানীয় টানছে। পশুপাখিরাও খাঁচার মধ্যে শেডের তলায় সরে গিয়ে ঝিমোচ্ছে। গরমটা ক'দিনই বেশ বেশী পড়েছে। আজ বুঝি আরও বাড়বে।

এই চিড়িয়াখানার মধ্যে হাঁটতে আজকাল অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি হয়। যেন কত পরিচিত জায়গায় পা ফেলছি। অনেক গাছই প্রায় আত্মীয়-স্বজনের মুখের মত চেনা। কোনোটাকে দেখে চমকে যাই, মনে হয়, রাতারাতি এত বড় হয়ে গেছে! যেন কাল কিংবা পরশুই একে কত্তো ছোটো দেখেছি। কোনো কোনোটার ডালপাতার ছাঁটকাট দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি,

আর ভাবি, ইস্, কত পাল্টে গেছে!

অথচ ভেবে দেখলে, সত্যিই কি তাই? রাতারাতি গাছ কিছু পাল্টে যেতে পারে না। বড় হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এই ক'দিন চিড়িয়াখানায় এসে ইস্তক তো অসুখেই ভুগলাম। যে ক'দিন ভাল থাকলাম, সেও এমন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে গেলাম যে, গাছগুলোর দিকে কখনো ভাল করে যে তাকাবার সময় পেয়েছি, এমন তো মনে হয় না।

তাহলে মনের এই অনুভূতিটা কি মনের ধাঁধা মাত্র, না কি অন্য কিছু?

বাংলো বাড়িটায় প্রথম এসে ক'দিন যে অস্বাভাবিক অবস্থা হয়েছিল, চলতে-ফিরতে অনবরত একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ধাক্কা খাচ্ছিলাম, সেটা খানিকটা কেটে গিয়েছে। আবছা হয়ে গেছে মনের ধাঁধা।

এখন আবার বাগানের গাছগুলোর মায়ায় যেন জড়িয়ে পড়ছি। চোখ ফেরাতে পারি না যেদিকে তাকাই সেদিক থেকে।

আমার কি তবে মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গেল! শিবুদাদুর ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

নিজের অজ্ঞাতেই, কখন একটা গাছের গুঁড়িতে কান পেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। খেয়াল হতেও কান সরালাম না। ছোট-বেলার কথা মনে পড়লো। লাইটপোষ্টে কান পাতার কথা। মনে হলো, অনেক দূরের কোনো গাছে যদি কেউ শব্দ করে সংকেত পাঠায়, কানের সঙ্গে ধরে রাখা ট্রানজিস্টার সেটের মত যদি এই গাছটার বুকের মধ্যে কিছু এই মুহূর্তে বেজে ওঠে, আর আমি শুনতে পাই? কিন্তু কি বাজবে—গান, বাজনা, কথিকা, নাটক? হাসলাম, তা কি সম্ভব? কোনো দূর দুর্গম বনের মধ্যে কাঠুরের কুড়ুলের শব্দ, কি কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁটের আওয়াজ উঠছে, কিংবা গাছের গুঁড়িতে হাতির পিঠ চুলকানোর ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস, বাঘের নখের আঁচড়, গাছের ডালে পাখপাখালির বা

বাঁদর দলের কিচিরমিচির, যদি এই আলিপুরের বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনা যেত!

কিন্তু পাগল না মাথা খারাপ, এমন কথা ভাবছি কেন আমি? একি কস্মিনকালেও সম্ভব! গাছ তো আর অয়্যারলেস-সেট নয়।

হঠাৎ একটা হাঁচির শব্দ শুনে, গাছের গা থেকে কান তুলে তাকাই। মনে হয়, একটু দূরের রঙ্গনগাছের ঝোপের আড়ালে কালো মতন কিছু একটা সাঁ করে সরে গেল। এতক্ষণের আবছা স্বপ্নের মত ঘোরটা আমার কেটে গেল এক মুহূর্তে। দুর্বল শরীরেও আমি দুই লাফে ঝোপটার সামনে গিয়ে পড়ি।

'একি! বনমালী! তুমি এখানে কি করছো?' আমি প্রশ্ন করি।

বনমালী মামার নিজস্ব বাগানের বুড়ো মালী। এখানে তার কাজ করতে আসার কথা নয়। প্রায় হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে বনমালী আমার চোখে-চোখে তাকায় না, হাত কচলে বলে, 'কিছু না দাদাবাবু, এমনি।'

প্রথম থেকেই বনমালীকে আমার সুবিধের ঠেকেনি। সুযোগ পেলেই যে ও আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে লক্ষ্য করে, আমি একাধিক দিন দেখে ফেলেছি। সেদিন ছাদের ওপর থেকেও বুঝি বনমালীকেই দেখতে পেয়েছিলাম। তারই বিড়ির টুকরো সেই ঝোপের আড়ালে দেখতে পেয়েছিলাম, এখন সন্দেহ হয়। কিন্তু আমাকে নজরে রাখছে কেন, রেখে ওর কি লাভ, এই স্পায়িং ও অন্য কারো হয়ে করছে কি?

আমার মনের এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার কেউ নেই, উত্তরও সম্ভবত নেই।

'কিছু না দাদাবাবু, এমনি!' আমি ওর কথাটা দিয়েই ওকে ধমক লাগালাম, 'কী ব্যাপার, সত্যি কথা বলো। না হলে আজকে আর তোমার রেহাই নেই।'

এতটা কঠোর হয়ে ওকে হয়তো ধমকাতাম না, যদি না ও

আমার একটু আগের ছেলেমানুষী দেখে ফেলতো।

বনমালী অনেকভাবে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে দেখলো। কিন্তু না পেরে শেষপর্যন্ত বললো যে, আমি নাকি ওর চেনা এক-জনের মত দেখতে। হাঁটা, বসা ও কথা বলায় নাকি ছু'জনের মধ্যে ভারি মিল। প্রথম দিন আমাকে দেখে নাকি বনমালী তাই চমকে গিয়েছিল।

'গোঁজামিলের গল্পটা ভালই বানিয়েছ, বনমালী!' আমি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলি, 'কিন্তু বাপু, আমার কাছে ওসব শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকবে না। তোমার সেই চেনা লোক কোথায় থাকে, নাম-ঠিকানা বলো, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসতে চাই।'

বনমালী হাত জোড় করে বললো, 'দাদাবাবু, বিশ্বাস করুন আমি মিথ্যে কথা বলছি না।'

'বেশ তো, তার প্রমাণ দাও। কোথায় থাকে সে?' আমি নরম হই না।

বৃদ্ধ বনমালীর মুখের ওপর একটা করুণ বিষাদের ছায়া পড়লো! তার চোখ তুটো মনে হলো ধীরে ধীরে জলে ভরে এল।



॥ ৯ ॥

মর্নিং-শো সিনেমা দেখে ফিরছিলাম।

চারপাশ রোদে-পড়া আয়নার মত ঝলসাচ্ছে। তাকানো যায় না।

একটা রঙীন রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের ছবি দেখে বেরিয়েছি, মাথাটা এমনিতেই ঝিমঝিম করছিল, তার ওপরে রোদের তাত। মনে হচ্ছে, কেউ আমার মাথার ওপর জ্বলন্ত হীটার বসিয়ে দিয়েছে।

মিঠু হঠাৎ বায়নাক্কা জানালো, 'পুপেদা, ভালুক-খেলা দেখবো।'

কোথায় ভালুক-খেলা হচ্ছে প্রথমটায় দেখতে পাইনি। ডুগ-ডুগির শব্দ কানে যেতেই সেইদিকে তাকালাম। দেখি, একটা গাড়িবারান্দার নিচে কারা ভালুক আর ভেল্কির খেলা দেখাচ্ছে।

এ-সময়ে খেলা দেখার একদম ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ছায়ায় একটুক্ষণ জিরিয়ে নিলে মন্দ হতো না ভেবে বললাম, বেশ চল্।'

কিন্তু আমরা গিয়ে দাঁড়াবার আগেই খেলার আসর ভেঙে গেল।

'খেল খতম, পয়সা হজম' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ওরা তখন পাততাড়ি গুটোচ্ছে আর পয়সা কুড়োচ্ছে। ওরা মানে, দু'টি মানুষ। একজন বয়স্ক, বেজায় ঢ্যাঙা, গাঁজাখোরমার্কা শিরিঙ্গে চেহারা, চোখ হলদে আঙারের মত জ্বলজ্বলে। মানুষের চোখ যে এমন হতে পারে, জানা ছিল না। লোকটার মাথায় মস্তবড় বাবুই-বাসার মত চাপ-চাপ কোঁকড়া চুলের বাবরি। অন্যটি বোধহয়

ছোট ছেলে, বয়স অনুমান করে কার সাধ্যি! লিকলিকে সরু হাত-পা, পিটপিটে চোখমুখ, দড়ি পাকানো চেহারা। হঠাৎ তাকে দেখলে বাঁদর বলে ভুল করা বিচিত্তির নয়।

মিঠু চেঁচিয়ে উঠলো, 'পুপেদা, ওই ছ্যাখো, ছয়-আঙুলে!'

আমি পা দিয়ে মিঠুর পা-টা মাড়িয়ে দিতেই, মিঠু সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল। ছ-আঙুলের ওপর আমার চোখ আগেই পড়েছিল। ঢ্যাঙা লোকটার ডান-বাঁ দু'হাতেই বুড়ো আঙুলের গা থেকে একটা করে মিনি আঙুল বেরিয়েছে। কিন্তু ছ-আঙুলে মাত্রেই সন্দেহজনক ক্যারেকটার নয়। ওরকম লোক কলকাতায় শ'য়ে শ'য়ে আছে। কিন্তু আমার মনোযোগ তখন লোকটার আঙুলের দিকে নয়, তার হাতের জিনিসটার দিকে। একটা গাঁজার কলকে বের করে তাতে লোকটা বুঝি গাঁজা ঠাসছিল। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম, আমার কুড়িয়ে পাওয়া কলকে এটা নয়, কিন্তু খুঁজে দেখলে অনেক মিল আছে। এটাও চুনার পাথরেই তৈরি।

'যা জোরে পা মাড়িয়ে দিয়েছো না!' মিঠু নিচু গলায় অভিযোগ জানায়, 'এখনো দস্তুরমত জ্বালা করছে।'

'সো স্যরি!' আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়, 'বাড়ি ফিরে চ, আমি আচ্ছা করে আয়োডিন লাগিয়ে দেবো। মেয়েরা আরশোলা আর আয়োডিনকে সাধ্যমত শরীর থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করে—যেমন ভয় করে চোর-মাতাল আর পাগলকে। যাদের গতি-বিধির, মানে মতিগতির কোনো স্থিরতা নেই।

আয়োডিন লাগানোর কথাতেই মিঠু এমন ভাবে শিউরে উঠলো, যেন সেই মুহূর্তেই তার পায়ে আয়োডিন লাগিয়ে দিয়েছি। মিঠুর সঙ্গে বাইরে মজা করছিলাম বটে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন উল্টোপাল্টা চিন্তার স্রোত ছুটে চলছিল। চিড়িয়াখানা ষড়যন্ত্রের ঘটনাগুলো আগাগোড়া দ্রুত ভেবে নিতে চেষ্টা করছিলাম।

'মিঠু, তুই একাই বাড়ি ফিরে যা, আমি একটু বাদেই আসছি।'

'কেন, তুমি কোথায় যাবে?' মিঠু অবাক হলো।

'আমার এক জায়গায় একটু দরকার ছিল, বেশী দেরি হবে না।'

সন্দিগ্ধ চোখে বার দুই পিছু ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে মিঠু চিড়িয়াখানার গলিপথে রওনা হলো। কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালো, 'যদি পারো, টর্চের একজোড়া ব্যাটারি কিনে এনো তাহলে, তোমার টর্চের দশা ভাল নয়।'

মিঠুর পরামর্শ মত মনং-শোয়ে আসবার সময় পেন্সিল-টর্চটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। দেরিতে সিনেমা হলে ঢুকলে, চলতে বড় অসুবিধে হয়। আজ হাতে-হাতে ফলও পেয়েছি। পৌছাতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।

চেঁচিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, তুই যা।'

মিঠু অদৃশ্য হলো। এদিকে কলকেতে গোটা দুই টান দিয়ে সেই ঢ্যাঙা লোকটাও উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটিকে উর্দু ভাষায় কী সব বলে ভালুকটাকে সঙ্গে নিয়ে লোকটা উল্টোদিকের রাস্তা ধরলো। লোকটা চলে গেলে ছেলেটা হাওড়া ইষ্টিশানের ক্ষুদে কুলির মত কাঁধে মাথায় গুটিকতক বোঁচকাবুচকি নিয়ে চিড়িয়াখানার পথেই রওনা দিল। ভালই হলো। ছেলেটিকে ফলো করাই সবদিক থেকে সুবিধের হবে, ভেবে নিয়েছিলাম আগেই। এবার চিড়িয়াখানার দিকে চলেছে দেখে আরও খুশী হলাম। আমি বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে, ওকে অনুসরণ করে চললাম।

কিছুটা পথ গিয়ে, ছেলেটা খোলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘরখানার সামনের দিকে কোনো জানালা নেই, শুধু একটা দরজা। সেটাও তালা-বন্ধ। নিচু হয়ে তালাটা খুলে মালপত্তর সমেত ছেলেটা ভেতরে ঢুকে গেলে আমি সাবধানে এগোলাম। রোদে ঝাঁঝানো রাস্তা থেকে ভেতরটা সিনেমা হলের

মতই অন্ধকার দেখাচ্ছিল, ভেতরটা দূর থেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কি করবো, ইতস্তত করছি, এমন সময় ছোট্ট একটা তোলা উনুন নিয়ে ছেলেটা বাইরে বেরিয়ে এল। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে ও লক্ষ্যই করল না! চুলোয় আগুন দিয়ে, রাস্তার ওপারে চাপাকলে নাইতে চলে গেল। আমি আরও এগিয়ে, এবারে ওর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার ভেতরটা দেখতে পাওয়া গেল।

ঘরটা কাকের বাসার মত এলোমেলো হয়ে আছে। নানা ধরনের শেকড়-বাকড়, কন্দমূল, মরা পশুর চামড়া, মড়ার মাথা, হাড়গোড়, শুট্‌কীমাছের মত শুকিয়ে রাখা পাখি-টাখি, আর শিশি বোতলে ভরা নানা রঙের তেলজল। এরা ভালুক নাচায়, ভোজবাজি দেখায়, ওষুধপত্র বেচে। আরও কি করে, কে জানে!

ভেতরে হঠাৎ মিহি গলার কান্না শুনে চমকে গেলাম। খুব চেনা-চেনা লাগলো। আমি বাজিকরের ছেলেটির দিকে তাকালাম। চালাঘরের সামনে রাখা উনুন থেকে বিস্তর ধোঁয়া উঠছিল। ঘন ধোঁয়ার আড়ালে পড়ে যাওয়ায় ছেলেটিকে ভালো করে দেখাই যাচ্ছিল না। শুধু চাপাকলে জলের শব্দের ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, ছোঁড়া জলের ফোয়ারার তলে বসে খুব আহ্লাদ করে স্নান করছে। আমি এই সুযোগে হেঁট হয়ে চালাঘরের নিচু দরজা গ'লে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ঢোকবার মুহূর্তে একবার মনে হলো, বোধ হয় ভুল করছি, এখানে কোনো রহস্য নেই। জীবিকায় এরা নিতান্তই বেদে টাইপের। এই কাজ করেই দিনগত পাপক্ষয় করে। শুধু ছ'টি আঙুল, গাঁজার কলকে, ভালুক (যদিও শ্বেতভালুক নয়) আর চিড়িয়াখানার কাছাকাছি থাকে, এই পয়েণ্টে এদের সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না। তবু ভেতরের মিহি গলার কান্নাটা খুব সন্দেহজনক। কোনো বাচ্চা ছেলে বা মেয়েকে হয়তো এরা আটকে রেখেছে।

ঘরের ভেতর বাতাস কেমন ভ্যাপ্সা। কেমন যেন পাঁচন-পাঁচন ঝাঁঝালো গন্ধ! দু'টি খাটিয়া, একটা সিন্দুকের মত প্রকাণ্ড সাইজের কালো কাঠের বাক্স, খান তিন-চার কলাই-করা বাসন, ব্যস্। এই খাটিয়ার একটা পায়ার সঙ্গে একটা বাঁদরের বাচ্চাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। সেইটেই কাঁদছিল। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে, কান্না থামিয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছে।

কয়েক পা কাছে গিয়েই কিন্তু চমকে গেলাম। আরে, এ তো বাঁদরের বাচ্চা নয়, মামার সেই হারানো উল্লুক। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে উংফুল্লর যেন আর আনন্দের সীমা নেই। বন্দী অবস্থাতেই ঘন ঘন ডিগবাজি, সেল্যুট আর হাততালি দিতে লাগলো। ও এখানে কি করে এল?

এখন অবিশ্যি বোকার মত সময় নষ্ট করার সময় নেই। ছেলেটা যে কোনো মুহূর্তেই এখন স্নান শেষ করে ঘরে ফিরে আসতে পারে। তাড়াতাড়ি উংফুল্লর গলার বকলসটা খুলে দিলাম। উল্লুকটা সঙ্গে সঙ্গে আমার পা জড়িয়ে ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি, পরে টের পেলাম, ও আমাকে ঘরের কোণে বাক্সটার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। কিছু একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই।

বাক্সে চাবি দেওয়া আছে কিনা টেনে দেখতেই ডালাটা উঠে এল। পকেট থেকে পেন্সিল-টর্চটা টেনে নিয়ে জ্বাললাম। আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য। বাক্সটার তলা নেই। যেখানে কাঠের তক্তা থাকবার কথা, সেখানে তার বদলে একটা গর্তের মুখ দেখা যাচ্ছে। গর্তটা গভীর, প্রায় কোমর সমান কি বুক সমান হবে। স্পষ্টই বোঝা যায়, মেঝে খুঁড়ে এই গর্ত বানানো হয়েছে। তারপরে গর্তের ওপর তলা-খোলা একটা কাঠের বাক্স চাপা দেওয়া হয়েছে, যাতে বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলে বাইরে থেকে কারো বোঝার সাধ্যি না থাকে যে, এখানে মেঝেতে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে।

আমি যখন এইসব ভাবছি, উৎফুল্ল ঝপাং করে বাক্সের মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়লো। আমাকেও নামবার জন্যে হাবেভাবে ডাকতে লাগলো। দোটানায় পড়ে গেলাম। আর ঝুঁকি নেওয়া উচিত হচ্ছে না বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু উৎফুল্ল যে বিশেষ কিছু দেখাবার জন্যেই অমন করে ডাকছে সেটাও বুঝতে পারছিলাম। এবং আরও বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম, এরা সহজ সাধারণ ভালুক-নাচিয়ে মোটেই নয়। তলায় তলায় এদের অন্য অসাধু মতলব আছে, নইলে এমন সব বেআইনী ব্যবস্থা থাকতো না। সুতরাং রহস্যের একেবারে দরজায় পৌঁছে এভাবে ফিরে যেতে মন সরলো না। আর ছেলেটি যদি নিতান্ত এসেই পড়ে তাকে টিট করে পালিয়ে যেতে আমাকে হয়তো বেগ পেতে হবে না।

বাক্সের মধ্যে নেমে পড়লাম। নেমে পড়েই চক্ষু ছানাবড়া! শুকনো গর্তের মধ্যে কোথা থেকে জলের শব্দ আসছে। ঠিক যেন একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে কলকল শব্দ করে। ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি টর্চ ফোকাস করলাম। দেখি আমার ডানদিকে সুড়ঙ্গ। ঢালাই কংক্রিট ভেঙে সুড়ঙ্গের মুখটা বের করা হয়েছে।

হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতরে এগিয়ে গেলাম। সুড়ঙ্গ হাত তিন-চার গিয়েই শেষ হয়েছে। সুড়ঙ্গের শেষ মুখটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা বিরাট জলনিকাশী পাইপের পেটের মধ্যে। কংক্রিটের পাইপের পেটের কাছটায় একটা মস্তবড় গর্ত কাটা হয়েছে—যার মধ্যে দিয়ে একটা মানুষ স্বচ্ছন্দে গ'লে যেতে পারে। উঁকি মেরে দেখলাম জলের শব্দটার উৎস এই ড্রেনপাইপ। তার তলা দিয়ে নোংরা ঘোলা জলের স্রোত ছুটে চলেছে প্রায় ফুটখানেক গভীর হয়ে।

পিছু হটে আবার আগের গর্তের মধ্যেই ফিরে এলাম। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই যে এই গোপন পথটা তৈরি করা হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু জলনিকাশী পাইপের মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে, সেইটে কিছুতেই মাথায় ঢুকলো

না। কর্পোরেশনের এই পাইপ মাটির তলা দিয়ে কোথায় গিয়েছে কে জানে। হয়তো গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি, হঠাৎ উর্দু ভাষায় কথা শুনে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁক করে উঠলো। গলা শুনেই চিনতে পারলাম, সেই ঢ্যাঙা ভালুক-নাচিয়ে লোকটা ফিরে এসেছে। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভবত ছেলেটাকে গালাগাল করছে। আমার গা-হাত-পা কাঁপতে লাগলো। বুঝলাম, ঝুঁকি নেওয়ার ফল হাতে হাতে ফললো। আমার আজ আর রক্ষে নেই। এই সাংঘাতিক নেশাখোর লোকটার কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ার পরিণাম ভেবে মনে মনে শিউরে উঠলাম। গর্তের মধ্যে উবু হয়ে বসে বসে চরম মুহূর্ত গুনতে থাকলাম।

এমন সময় আমার ঘাড়ের ওপর কেউ বেশ জোরে একটা ফুঁ দিল। ভীষণ চমকে গিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একতাল অন্ধকারের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ ঘটলো। পরের মুহূর্তেই সেই অন্ধকারকে সনাক্ত করতে পারলাম। সেটা একটা ভালুকের প্রকাণ্ড কালো মাথা। গুঁতোটা লেগেছিল আমার কপালের সঙ্গে ভালুকটির ভিজে নরম নাকে। এবং গোত্তাটা লেগেছিল মোক্ষম রকম জোরেই। নইলে অতবড় জন্তুটা ধাক্কা খেয়ে কয়েক ইঞ্চি কক্ষনো পিছিয়ে যেত না।

আমি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ভুললাম না। হাত বাড়িয়ে চোখের পলকে বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু ভালুকটা মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেলেও ক্ষিপ্ত আক্রোশে কাঠের বাক্সটাকে দাঁতে নখে আক্রমণ করলো। তার চাপা গর্জন আর দাঁতের কড়মড় শব্দ শুনে ভয় হলো, হয়তো বাক্সটাকে সে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলবে, নয় নির্ঘাত উল্টে দেবে। আর তাহলেই---

চমকে গিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে দেখি উৎফুল্ল। আমার জামা ধরে টানছে। সত্যি ওর কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে বুঝতে পেরে,

উৎফুল্ল আবার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর ঝপাং করে একটা শব্দ। বুঝলাম, ও পাইপের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। আমার মাথার মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎচ্চমকের মত একটা চিন্তা খেলে গেল। আমাদের বাঁচার এখন এই একটা রাস্তাই সামনে খোলা আছে। এক্ষুনি অসহায়ের মত শত্রুর হাতে বন্দী হওয়ার বদলে, আরও কিছুক্ষণ আত্মগোপন করে থেকে, পালাবার কোনো সুযোগ অন্ততঃ মিলে যেতে পারে।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গটুকু পার হয়ে পাইপের মধ্যে নেমে পড়লাম। বিপদের গন্ধ বুঝি উৎফুল্লও পেয়েছিল। কারণ তার মুখে উল্লুকোচিত হুপ্ হুপ্ শব্দ থাকলেও, পাইপের মধ্যে সে আর নিশ্চল না। জল ছিটোতে ছিটোতে সে ছুটে চলেছিল। টর্চের আলো জ্বেলে, যতদূর সম্ভব নোংরা জল বাঁচিয়ে, আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। দু'পা ফাঁক করে দুইপাশে ফেলে ফেলে আমাকে জলের স্পর্শ যথাসম্ভব বাঁচাতে হচ্ছিল।

সুড়ঙ্গ-মুখে তখন হৈ-চৈ শোনা গিয়েছে। আমাদের পলায়নের সংবাদ সম্ভবত শত্রু পেয়ে গেছে। এই বদ্ধ সুড়ঙ্গের মধ্যে যে কোনো সামান্য শব্দই চার গুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে। তাই মনে হচ্ছিল, পিছনে লাউড স্পীকারে বুঝি কারা ক্রুদ্ধ মেজাজে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে।

পাইপটা খুব বড় মাপের। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চলতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সেটা এক জায়গায় এসে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ দুটো পাইপের মুখ এসে এই বড় পাইপের মধ্যে মিশেছে। একবার মাত্র ইতস্তত করে উৎফুল্ল বাঁ দিকের পাইপের [illegible] ঢুকে গেল। আমিও ঢুকবো কিনা চিন্তা করতে লাগলাম। কারণ পাইপ এখানে ছোট ব্যাসের। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথায় সিলিং ঠেকে যায়। তাছাড়া এই প্রথম আবিষ্কার করলাম, এতক্ষণ আমরা স্রোতের উজানে এগিয়ে এসেছি এবং এখনো তাই যেতে যাচ্ছ। অর্থাৎ কিনা

আমরা গঙ্গার দিকে না গিয়ে, সম্ভবত তার বিপরীত দিকে চলেছি। এ-পথে চললে ক্রমশ অন্ধ গোলকধাঁধার মধ্যেই কি জড়িয়ে পড়বো না ?

কিন্তু শত্রুরাও যদি পাইপের মধ্যে নেমে পড়ে থাকে, তাহলে এখন আর পিছনে ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না। বরং যাকে বলে অ্যানিমেল ইনটুইশন—জান্তব চেতনা, তাকে অনুসরণ করাই বোধ করি ভাল।

আমি বাঁ দিকের পাইপের মধ্যে ঈষৎ কুঁজো হয়ে ঢুকে পড়লাম। ময়লা জল থেকে এখানে আর গা-পা বাঁচানো গেল না। জল এখানে আরও গভীর—প্রায় হাঁটু ডুবোন। বাতাস একটু গরম আর ভারী। অসাবধান হলেই সিলিং-এ মাথা ঠেকে যায়। একবার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা খনির মধ্যে নেমেছিলাম। ঠিক সেইরকম লাগছে। মনে হচ্ছে, কোনো নিচু গ্যালারির মধ্যে দিয়ে চলেছি।

কিন্তু শত্রুর পদধ্বনি পিছনে ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে গোলমাল. জোরালো টর্চের আলো দূরে জলের ওপর ঝলসে ঝলসে উঠছে। আমি আর এখন হাঁটছি না, ছুটে চলেছি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছি। কিন্তু জলের মধ্যে পা ফেলে দৌড়নো বড় শক্ত। তার ওপর জলের তলাটা শ্যাওলায় শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে। পা স্লিপ করে বার দুই সেই নোংরা জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে উঠলাম। অথচ থামবার উপায় নেই, পিছনে যেন লাউড স্পীকারে শত্রুর গলা গম্‌গম্ করছে। দম ফুরিয়ে এসেছে আমার। কিন্তু উৎফুল্ল একটুও কাহিল হয়নি যেন !

উৎফুল্ল আচমকা এক জায়গায় ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিল ছাদের দিকে। এবার অবাক হবার পালা আমার। মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে নাকচ করে দিয়ে, উৎফুল্ল সেই মসৃণ সিলিং-এ ঝুলতে লাগলো। কয়েক পা



নিশ্চিত মৃত্যু তখন আমার সামনে। একটা প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক, বোধ হয় কাল রাতের দেখা সেই ভালুকটাই, একটা দাঁতাল বিভীষিকার মতই আমাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

এগিয়ে আলো ফেলতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হলো। ছাদের গায়ে দুটো লোহার আংটা, ও তারই একটা ধরে দোল খাচ্ছে আর উল্লুকের ভাষায় কিচিরমিচির করে কি বকে চলেছে।

কৌতূহলী আমি কাছে গিয়ে আংটা দুটো পরখ করার জন্যে সবে হাত বাড়িয়েছি, অমনি পিছনে জলের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে কারো ছুটে আসার ঝপাং ঝপ শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার পেন্সিল-টর্চের সামান্য আলোয় সামনে যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। নিশ্চিত মৃত্যু তখন আমার সামনে। একটা প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক, বোধ হয় কাল রাতের দেখা সেই ভালুকটাই, একটা দাঁতাল বিভীষিকার মতই আমাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

এই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের মধ্যে, হাঁপিয়ে পড়া দুর্বল শরীরে, শুধু হাতে অমন একটা প্রকাণ্ড ক্ষিপ্ত ভালুকের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া মারাত্মক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তবু দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই, চোখ বুজে সেই বীভৎস মৃত্যুকে বরণ করা ছাড়া। আমি আংটায় হাত রেখে একটা দুঃসাহসী ঝুঁকি নেবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম, মরবার আগে শেষ মরণ-আঘাত হানবার জন্যে।

১০ ॥

দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টার বাংলা বন্ধ-এর মত আমি নিজের ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছি। মামার কঠোর নির্দেশ রয়েছে, ঘুম আসুক বা না আসুক, আমাকে বিছানায় শুয়ে কমপ্লিট রেস্ট নিতে হবে। কারো সঙ্গে কথা নয়, গল্প নয়, দেখা-সাক্ষাৎ নয়। একটু আগে মামী এসেছিল, আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে আবার দরজায় হুড়কো টেনে দিয়ে গেল। আমি দু-একবার মামীকে কথা কওয়াতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি। ঠোঁটে তর্জনী তুলে সে যেন মুখে কুলুপ টেনে দিয়েছিল।

এদিকে আমার অবস্থা কাহিল। সেই যমের মত অনিবার্য ভালুকের হাত থেকে কি করে আমি বাঁচলাম এবং অক্ষত দেহে সেই জলনিকাশী পাইপের মধ্য থেকে উদ্ধার পেলাম, স্পষ্ট করে কিছুই জানি না। মিঠু আমাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে ভাসা-ভাসা কিছু খবর দিয়ে গেছে, তার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে মিঠু নিজেও জানে না।

ডি-এস-পি-র নির্দেশে সাদা পোষাকের পুলিশ নাকি আগে থেকেই আমার ওপরে নজর রেখেছিল। আমার সিনেমায় যাবার সময় থেকেই। তাই এ-যাত্রা খুব বেঁচে গেছি। ভালুক-নাচিয়ে সেই ঢ্যাঙা লোকটিকে পুলিশ তার চালাঘরের মধ্যেই গ্রেপ্তার করে। তারপর জলনিকাশী পাইপের মধ্যে তল্লাসী চালিয়ে একটা শ্বেত ভালুকের মৃতদেহ জাপটে আমাকে ড্রেনের জলের

মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে। আমি নাকি তখন অজ্ঞান। ভালুকের পিঠের ওপরে না পড়ে যদি নিচে পড়তাম, তাহলে সেই পাঁক জলে ডুবেই আমার মৃত্যু হতো। যেমন মৃত্যু ঘটেছিল সেই ভালুকটির। জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সে মারা গিয়েছিল। অবশ্য ভালুকটির বিষয়ে আরও চমকপ্রদ খবর আছে। ভালুকটি আসলে সত্যিকারের ভালুক নয়, শুধু ভালুকের চামড়ার খোলস মাত্র। অবশ্য এই ভালুকের খোলের মধ্যে খেলা-দেখানোর সাকরেদ সেই রোগা পটকা ছেলেটা সেঁধিয়েছিল। আমার দেহের তলায় চাপা পড়ে জলে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা গেছে সে-ই। এ-খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়েছে, যদিও খুবই অস্পষ্টভাবে, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগের মুহূর্তে আমি সিলিং-এর আংটা দু'হাতে ধরে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালুকটিকে মেরেছিলাম জোড়া পায়ের এক লাথি। তারপরে কি ঘটেছিল, আমার মনে নেই। মৃত্যুভয়ে, উত্তেজনায় এবং শ্রান্তিতে চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এসেছিল, অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে।

লোহার আংটা-দেওয়া জায়গাটায় একটা গুপ্ত পথ আছে, যেটা নাকি চিড়িয়াখানার মধ্যে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। যে ফাঁকা খাঁচার মধ্যে সে-রাতে ভালুকের সন্ধানে আমরা ঢুকেছিলাম. গুপ্তপথের মুখটা সেই খাঁচা-ঘরের মেঝে ফুঁড়ে উঠেছে। ওরা বোধ হয় নিয়মিত ওই পথেই চোরা কারবার করতো। উৎফুল্লকেও সম্ভবত ওই পথেই নিয়ে গিয়েছিল চুরি করে। নইলে পুলিশকে সে কি করে ওই পথের সন্ধান দিল!

এই চিড়িয়াখানা ষড়যন্ত্রের নাটের গুরুকে অবশ্য পুলিশ এখনো ধরতে পারেনি, কিন্তু তার ডানহাত বিচ্ছু সিং ওরফে ভালুকঅলা ধরা পড়েছে। লোকটি নাকি চুনার অঞ্চলের দাগী আসামী, এখানে এসে গা ঢাকা দিয়েছিল। চার-পাঁচটা খুনের মামলা ওর নামে ঝুলছে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমছুট চোখে যখন বিরক্তির



এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘুমছুট্ চোখে যখন বিরক্তির শেষ সীমায় গিয়ে পেঁৗছেছি, তখন হঠাৎ নজর পড়লো বুক-শেল্‌ফটার দিকে।

শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁচেছি, তখন হঠাৎ নজর পড়লো বুক-শেল্‌ফটার দিকে। এই ঘরটার দখলীস্বত্ব যেদিন প্রথম পেয়েছিলাম সেদিনই শেল্‌ফটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু গল্পের বই ঠাসা এই শেল্‌ফটায় আজ অবধি হাত দেবার অবকাশ পাইনি।

হ্যাত্তেরি, ঘুমের নিকুচি করেছে! মনে মনে কথা কয়টা বলে খাট থেকে নেমে গিয়ে খান কয়েক বই নিয়ে আবার ফিরে এলাম। বিছানায় বসে নাড়াচাড়া করতে করতে অদ্ভুত একখানা হাতে-লেখা বই চোখে পড়লো। নামটা বড় অবাক করার মত: দি অ্যালবাম অফ দি জু-ফ্যামিলি। মানে, পশুশালা পরিবারের চিত্র-সংগ্রহ। সাধারণ বইয়ের মত সাইজ, ছাপা বইয়ের মতই ছবিওয়ালা মলাট, কিন্তু আসলে সেখানা ফটোগ্রাফের সংগ্রহ-খাতা। যদিও শুধু ফটোগ্রাফই তাতে নেই, পাতায় পাতায় রঙ-বেরঙের কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে কত কি লেখা! মধ্যে মধ্যে চাইনীজ ইঙ্কে আঁকা দু' চারটি স্কেচ, মজাদার ব্যঙ্গ চিত্র, যাকে ইংরেজিতে বলে কার্টুন, আর খবরের কাগজ কিংবা বিভিন্ন জার্নালের কাটিং আঠা দিয়ে আঁটা।

এই উপভোগ্য এবং একই সঙ্গে তথ্য ও ইতিহাসপূর্ণ এই খাতাখানা চালু হয়েছিল জমজমাট সাহেব আমলে। অনেক গুণীজন তখন এসেছেন চিড়িয়াখানায়। কেউ শিল্পী, কেউ সাংবাদিক, কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ সাহিত্যিক। তাঁরা বছরের পর বছর খেটে চিড়িয়াখানার অনেক দিনের ইতিহাস, মজার ঘটনা, স্মরণীয় চরিত্র-কথা লিখে রেখে গেছেন এতে। এতে আছে মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা। যারাই চিড়িয়াখানায় বাসিন্দা কিংবা কর্মী হয়ে এসেছে, দীর্ঘ দিন থেকেছে এবং বিদায় নিয়েছে, তাদের বিস্তৃত বিবরণ এতে আছে। অনেক পশুপাখিই কবে প্রথম এল, কোথা থেকে এল, তার ধরা পড়ার ইতিহাস, মৃত্যুর বিবরণ এবং ছবি। চিড়িয়াখানায় যাঁদের অবদান অনেক, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিদায়কালীন

ছবি, অটোগ্রাফ ইত্যাদি।

বইটি আমার কাছে চমকপ্রদ মনে হলো। শেল্‌ফ থেকে খুঁজে পেলাম এই বইয়ের আরও তু'টি খণ্ড। সম্ভবত, এই তিনটি খণ্ডই লেখা হয়েছিল, তারপর এই উদ্যোগে ভাঁটা পড়েছে। আর কেউ এগিয়ে আসেননি অবসর-বিনোদনের এমন অপূর্ব গ্রন্থ রচনায় প্রভূত পরিশ্রম করতে। পাতায় পাতায় চোখ বুলিয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম। এ যেন ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী, ইতিহাস, প্রাণীবিজ্ঞান এবং উপন্যাস একই সঙ্গে। হঠাৎ একটি পাতায় এসে যেন হোঁচট খেয়ে থমকে গেলাম। নিজের চোখকেই প্রথমে বিশ্বাস হলো না। পাতাটা চোখের কাছে এনে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। নাঃ, সন্দেহের অবকাশ নেই। চুল-দাড়ি সমেত এই ঋষি-পুরুষের মত চেহারা ভুল হবার নয়। তলায় নাম লেখা আছে—ডক্টর শিবপ্রসাদ ব্যানার্জি। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেন ঢাকের শব্দে লাফিয়ে উঠলো। এ ছবি নির্ঘাত আমাদের রহস্যময় শিবুদাত্নর। অজ্ঞাতপরিচয়, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো শিবুদাত্নকে বুঝি এতদিনে হাতে-কলমে ধরা গেল।

ছবিটা শিবুদাত্নকে ফেয়ার-ওয়েল দেবার সময়কার। জলার ধারে একটা ফুলঝোপের ধারে দাত্ন চেয়ার পেতে বসে আছেন, পায়ের কাছে ঘাসের ওপর ওড়িয়া মালী হাত জোড় করে বসে আছে।

বেশী কিছু অবশ্য লেখা নেই শিবপ্রসাদ ব্যানার্জি সম্বন্ধে।—উদ্ভিদ্‌বিত্তায় গবেষণা করে তিনি ডক্টর উপাধি পেয়েছিলেন। তারপর ফরেস্ট সার্ভিসের পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে সরকারী চাকরি পান। প্রথম জীবন বিচিত্র চাকরি-সূত্রে আফ্রিকায় কাটে। বাকি জীবন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। সবশেষে আলীপুর চিড়িয়াখানায়। এই জু-গার্ডেনের গাছপালা, পশুপাখির উৎকর্ষ সাধনে ডক্টর ব্যানার্জির অবদান অনেক।

বাবু শিবপ্রসাদকে চিড়িয়াখানার মধ্যে বিভোর অবস্থায় দেখলে অনেক সময় তাঁকে দ্বিতীয় রবিনসন ক্রুসো বলে ভুল হতো। এই কাল্পনিক দ্বীপের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে তিনি যেন তাঁর জগৎ গড়ে তুলেছেন। এই পশুপাখি, গাছপালাই তাঁর আত্মীয়-বন্ধু। মানুষের কাছ থেকে তিনি যেন বহু হাজার মাইল দূরে রয়েছেন। সরকারী কাজকর্মের বাইরে শিবপ্রসাদ দুটি অদ্ভুত নেশায় মেতে ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং যোগবিদ্যার চর্চা করতেন তিনি অবসর সময়ে। বহুবার ধ্যানগম্ভীর অবস্থায় তাঁকে এই চিড়িয়াখানারই কোনো গাছের নিচে দেখতে পাওয়া গেছে। ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে যাঁদের রাজর্ষি বলা হয়েছে, ব্যানার্জী যেন ছিলেন তাঁদেরই উত্তরসাধক। কিন্তু তবু এমন আত্মমগ্ন, খেয়ালক্ষ্যাপা, ভাবুক প্রকৃতির মানুষকে সাধারণের দৃষ্টিতে আধপাগলা মনে হতেই পারে।

তাঁর সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো— তুলি দিয়ে আঁকা একটি ছোট্ট কার্টুন। হাতীর শুঁড়ের মত দাড়িঅলা একজন মানুষ গাছের বুকে কান পেতে কি শুনছে। কার্টুনের নিচে মন্তব্য লেখা: Overhearing heart-beats, অর্থাৎ আড়ি পেতে হৃদ্‌স্পন্দন শুনছেন।

ডক্টর ব্যানার্জী সম্পর্কে আর বেশী কিছু লেখা নেই। তাঁর একমাত্র নাতিটিকে হারিয়ে তিনি যে অসময়ে অবসর গ্রহণ করলেন, সেকথা লেখা আছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো, বনমালী বলেছিল—বছর তিরিশ আগে এই চিড়িয়াখানায় এক সাধু সাহেব ছিলেন। তাঁর নাতির সঙ্গে নাকি আমার হুবহু মিল দেখে সে চমকে গিয়েছিল। বনমালীর গল্পটা, বলাবাহুল্য, আমি বিশ্বাস করিনি সেদিন। আজ ব্যাপারটার সত্যতায় চমকাবার পালা আমার। ডাঃ শিবপ্রসাদের পায়ের কাছে জোড়হাতে ভক্ত হনুমানের মত বসে থাকা মালীটি যে বছর তিরিশ আগের বনমালী স্বয়ং, এখন আর আমার সন্দেহ থাকলো না। তাহলে, এই আমি-টি কে? এ-বছর হায়ার-

সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেওয়া পুষ্কর দাশগুপ্ত ওরফে পুপে, না বছর তিরিশ আগের সেই কিশোরটি? ভয়ে বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

এমন সময় আমার ঘরের দরজার বাইরে কয়েক জোড়া জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন ডাঃ চন্দ, পুলিশ-সুপার স্বয়ং এবং মামা। আমি বইপত্র গুটিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

ডাক্তার চন্দ হাসিমুখে এগিয়ে বললেন, 'কি, কেমন আছ, পুষ্কর ভাই?'

'ভাল না।' আমি জানালাম।

'সে কি!' চন্দ ব্যস্ত হয়ে নাড়ি দেখলেন, স্টেথো বসালেন বুকে পিঠে, তারপর মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে বেশ ভালই দেখছি—'

আমি বেজার মুখে বললাম, 'সুস্থ মানুষকে এভাবে ঘরে বন্ধ করে রাখলে কি সে ভাল থাকে?'

আমার কথায় তিনজনই হো হো করে হেসে উঠলেন, প্রাণ-খোলা হাসি। ডাক্তার চন্দ বললেন, 'আমি তোমাকে ফিট সার্টিফিকেট দিচ্ছি এই মুহূর্তে।'

মামা হেসে ফেলে বললো, 'বেশ, আমিও এই মুহূর্ত থেকে বন্ধ্ তুলে নিলাম। ঘরে বন্ধ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকার দরকার নেই।'

পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেন্ট বললেন, 'আমি তাহলে ইয়ং ডিটেক-টিভের সঙ্গে একটু প্রাইভেট টক্ সারতে পারি। কি বলেন?'

ডাক্তার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, 'আমার কাজ ফুরিয়েছে, এবার আসি।'

মামা বললো, 'চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সেই সৌম্যদর্শন পুলিশ অফিসার আমার বিছানার খুব কাছে তাঁর চেয়ারখানা

টেনে আনলেন, 'ব্রাদার, তোমার কাছে একটু মার্জনা চাইবার আছে। পুলিশী কর্তব্যের খাতিরে তোমার ডায়েরীখানা আমরা আটক করেছিলাম এবং আছপান্ত পড়তে বাধ্যও হয়েছিলাম। নীতিগতভাবে এটা অন্যায়, আশা করি আমাদের এই আচরণ তুমি ক্ষমার চক্ষে দেখবে।'

এতবড় মানুষটির এই বিনয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি, একসময় আমি এই ব্যাপারটায় খুবই ক্ষুণ্ণ, বিরক্ত এবং বেকায়দা হয়ে পড়েছিলাম। সে উষ্মা আর অস্বস্তি কোথায় উপে গেল।

বললাম, 'কী যে বলেন'— !'

ভদ্রলোক বললেন, 'না, আমি ঠিকই বলেছি। তোমার অ্যানালিসিস এবং অনুমান আমাদের অনেক কাজে এসেছে। আমি মুগ্ধ হয়েছি, কর্তৃপক্ষকে তোমার বিষয়ে জানিয়েছি। এখন যে জন্যে আসা, তুমি যেসব জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছিলে, সেগুলি নাকি চুরি হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে গাঁজা জাতীয় একটা নেশার জিনিস—আচ্ছা তোমার কি মনে হয়, এগুলির সঙ্গে জু-গার্ডেনের ডাকাতির কোনো সম্পর্ক ছিল?'

আমি কোনো জবাব দিলাম না।. ব্যাপারটা নতুন করে ভাবতে আমার সময় লাগছিল, কারণ তখনো আমার জু-ফ্যামিলির অ্যালবামের ঘোর কাটেনি।

'ইয়ং ডিটেকটিভ, বলো, সংকোচ করো না আমার কাছে। আচ্ছা, সে-রাতে কি ঘটেছিল বলে তোমার ধারণা? ঝিলের জলের মধ্যে বন্দুকগুলোই বা ফেলতে গেল কেন! গাঁজার কলকে এক জায়গায় কুড়িয়ে পেলে, অন্য জায়গায় তার ঠিকরেগুলো এবং ন্যাকড়া—তারপর আবার সেগুলো চুরি হয়ে গেল—এসব নিশ্চয় কাকতালীয় ব্যাপার নয়। তুমি নিশ্চয় কিছু ভেবেছো এ-বিষয়ে?'

'হ্যাঁ ভেবেছি। কিন্তু আমার সে অনুমান কতদূর সত্যি

আমি জানি না।'

'দরকার নেই। সে জানবার ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি শুধু তোমার মনের চিন্তা প্রকাশ করেই খালাস হও, তারপর আমরা দেখছি—'

এ-রকম মানুষের কাছেই মন খুলে সব বলা যায়। আমিও বললাম, বিস্তারিত ভাবেই। আমার মূল কথাটা এই—সে-রাতের ডাকাতি বাইরে থেকে হয়নি। ডিউটি বদলের মুখে বিটের কনেস্টবল আর চিড়িয়াখানার পাহারাদার বাহিনী যখন একত্র হয়েছিল মেন অফিসের বারান্দায়, তখন ওখানে বেশ জমাটি একটা নেশার আড্ডা বসে গিয়েছিল। রোজ রাতেই সম্ভবত এক চক্কর নেশার বৈঠক বসে, কিন্তু সেদিন একটু বিশেষ রকম ব্যবস্থা ছিল। দু-দুটো কলকে হাতে হাতে ফিরেছে—কারণ গাঁজার সঙ্গে এমন কিছু মেশানো ছিল যার ধোঁয়া টানলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে সময় লাগে না। গেটের দারোয়ানের সঙ্গে যোগসাজসে ব্যাপারটা ঘটেছে। ভজুড়ি নামে মালীদের নতুন সর্দার আর দারোয়ান দু'জনে মিলে আয়রণ সেফের টাকাকড়ি পাচার করেছে বাজিকর আর তার ছেলেটি মারফত। তারপর বন্দুকগুলো নিয়ে গিয়ে জলার মধ্যে ফেলে দিয়ে মেন অফিসের বারান্দায় এসে বন্দী সেজেছে। হাত-পা বেঁধে, মাথায় একটা কমজোরী আঘাত করে আহত সাজিয়ে, ভজুড়ি দারোয়ানকে ফেলে পালিয়ে যায়। গল্পটা বানানোই ছিল। অন্যান্য পাহারাদারদের জ্ঞান ফিরে এলে দারোয়ান তাদের গল্পটি বলে। তারাও চাকরি যাবার এবং শাস্তি হবার ভয়ে নেশার ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যায়। দারোয়ানের গল্পই মুখস্থ বলে যায় জবানবন্দীর সময়। ফটক দিয়ে লরী ঢোকার গল্পটা ডাহা মিথ্যে। মাত্র চারজনে মিলে অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটিয়েছিল। কিন্তু এদের মস্তিষ্ক হিসেবে কোনো পঞ্চম ব্যক্তি নিশ্চয় আছে। এবং সে মানুষটি বাঙালী। এবং সে মানুষটিও সম্ভবত চিড়িয়াখানারই কর্মচারী।

সুপারিনটেণ্ডেন্ট এতক্ষণ গভীর কৌতূহলের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। এবার আমি থামতেই বললেন, 'ওয়াণ্ডারফুল, ব্রাদার, ওয়াণ্ডারফুল! ইউ আর সেন্ট পার্সেন্ট কারেক্ট। আমরা হাইলি অ্যানেস্থেটিক মিকশ্চারের সন্ধান পেয়েছি—যার ধোঁয়ায় মানুষ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমরা এই ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্কটির সন্ধানে রয়েছি, জানি না তাকে ধরতে ছুঁতে পারবো কিনা। কিন্তু আর একটা ব্যাপার আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে, তুমি নাকি একজন ভদ্রলোককে এখানে খুব আনাগোনা করতে দেখেছো! এই ঘটনার সময়ে তোমার সঙ্গে তিনি খুব ভাব জমিয়েছিলেন, এটা সত্যি?'

আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালাম।

'অথচ মজার বিষয় এই, তিনি এ-বাড়ির সমস্ত লোকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছেন, খুব কৌশলে সকলের চোখ এড়িয়ে গিয়েছেন।' সুপারিনটেণ্ডেন্ট গলার স্বর একপর্দা নামিয়ে বললেন, 'অনেকের ধারণা, ইনক্লুডিং তোমার মামা—অসুখে পড়ে থাকাকালে ক্রমাগত উদ্ভট চিন্তা করতে করতে নাকি তোমার মাথা, না, মানে তুমি হয়তো একধরনের অপটিক ইলিউশন, অর্থাৎ চোখের ধাঁধায় ভুগছো এবং সেই সঙ্গে এক ধরনের অবসেশন··· কিন্তু আমি ব্যাপারটাকে এভাবে উড়িয়ে দিতে পারছি না—আমার মনে হয় কোথাও একটা রহস্য—আই মীন, হয়তো দেখা যাবে এই চিড়িয়াখানা ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু তিনিই—যাকে তুমি মস্তিষ্ক বলেছো—'

ডাক্তারকে সম্ভবত বিদায় দিয়ে এমন সময় মামা ফিরে এল, 'ওঃ, আপনাদের প্রাইভেট টক্ এখনো শেষ হয়নি!' মামা চৌকাঠ ডিঙিয়েই আবার ফিরে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ডাকলেন, 'আরে আসুন, প্রাইভেট কিচ্ছু না, ওটা কথার কথা। ডাক্তারকে বিদায় করার ইশারা। আপনি আসুন, আপনার প্রেজেন্স এখানে দরকার।'

আমি এতক্ষণ চুপ করেছিলাম, এবার বললাম, 'আপনি জন্মান্তর মানেন?'

ভদ্রলোক মধুর হাসি হাসলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই মানি. কিন্তু যদি সরকারীভাবে বলতে বলো, বলবো, ডকুমেন্টস্ অ্যাণ্ড প্রুফ নিয়ে আমাদের কারবার, যার প্রমাণ নেই, তার অস্তিত্বও নেই আমাদের পুলিশীরাজ্যে। জন্মান্তরের নিশ্চয়ই তা নেই?'

আমি বললাম, 'যদি থাকে, তাহলে?'

অশ্বিনীমামা গোল গোল চোখ করে এতক্ষণ আমার দিবে তাকিয়ে ছিল, এবার বললো, 'ছিঃ! পুপে, আবার পাগলামো শুর করেছিস! নিশ্চয় তোর সেই শিবুদাহুর কেস বলতে চাইছিস?'

আমি জোর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। শিবুদাহু ধোঁয়া না, গ্যাজ না, আমার মতিভ্রমও নয়। এই ছাখো'—আমি অ্যালবামের বইটার পাতা খুলে মামার মুখের ওপর বাড়িয়ে ধরলাম।

ওঁরা হু'জনেই ঝুঁকে পড়লেন এবং রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে লাগলেন।

'স্ট্রেঞ্জ! ভেরি, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!' সুপারিনটেণ্ডেন্ট আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন। মামাও খানিকটা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। বইটা সেও কতদিন হয়তো নাড়াচাড়া করেছে, কিন্তু প্রতিটি হিস্ট্রি কখনোই খুঁটিয়ে পড়েনি। মামা একটু পরে আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। তার ঠোঁটে হাসি। বারকতক চোখ খুলে আর বন্ধ করে বললো, 'আই সী! আসল রহস্যটা এতক্ষণে ধরতে পারলাম।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন, 'আসল রহস্য?'

'হ্যাঁ। এই ভূত কি করে আমার ভাগ্নের মাথায় ঢুকেছে—এতদিনে তার সোর্স আবিষ্কার করা গেল।'

'করা গেল?' ভদ্রলোক আবার যেন বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করলেন।

'করা গেল না?' মামা সহাস্যে বললেন, 'অসুখের আগে

কোনো সময় পুপে নিশ্চয় এই পাতাটি পড়ে ফেলেছিল, তা
ফলে অবচেতন মনে—'

আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। আমি কান্না পাও
গলায় বললাম, 'মামা, সত্যি না, এর আগে এ বই আ
আমি চোখেই দেখিনি—এই বিদ্যে ছুঁয়ে তোমাকে আমি'—

আমি আর কথা বলতে পারলাম না। আমি হঠাৎ শিউ
উঠলাম। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। দেখলাম, শিবুদাত্থ হাসিমুখে ঘ
ঢুকছেন, হাতে ধূমায়িত পাইপ।

আমি সেইদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, 'শিবুদাত্থ!'

মামা এবং সুপারিনটেণ্ডেন্ট ত্থ'জনেই চমকে উঠলেন। শিবুদাত্থ
চোখের পলকে অদৃশ্য। আমি আর তাঁকে দেখতে পেলাম ন
কিন্তু তামাকের গন্ধে ঘরটা হঠাৎ ভরে গেল। মামা আর পুলি
অফিসার ত্থ'জনেই ঘরের বাতাস শুঁকতে লাগলেন। যাক, শে
পর্যন্ত গন্ধটা নিশ্চয় ওঁদের নাকে গেছে!